সাহিত্য বিচিত্রা



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a text book for Class VII. Vide Notification No. T.B. 76/7/TB/107 Dated 14.12.76 and also Board's letter No RB/46/DS/I Dated 24.12.76

সাহিত্য বিচিত্রা

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

ডঃ নির্মলেন্দু দাস, এম. এ, বি. টি., পি. এইচ. ডি.
প্রধান শিক্ষক, আতাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৪ পরগণা।

ও

অগ্নিকুমার আচার্য, প্রধান শিক্ষক
বাইকোরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ত্রিপুরা।

বুক হোম

৩২ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
তড়িৎকুমার মজুমদার
বুক হোম
৩২, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭৫
সংশোধিত মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৬
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১
সংশোধিত মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৩

মূল্য : পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা

মুদ্রক :
শ্রীমুদ্রণ
১, খাসমহল রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায় ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন ; ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি বাঙলা সাহিত্যকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান অংশটি তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অংশ।]

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এডওয়ার্ডস সাহেব। যে আগে উঠিবে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা ? আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণ বধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে কানন-প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা ! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীবানন্দ। বল "হরে মুরারে !"

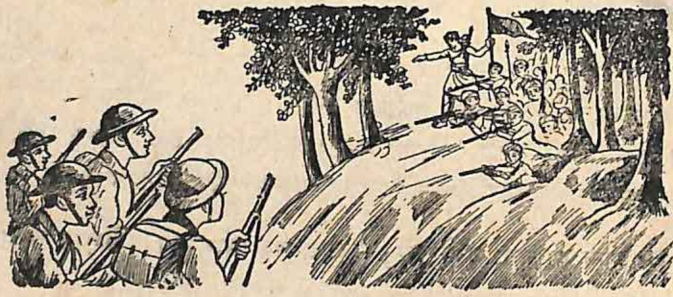
কানন-প্রান্তরে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "হরে মুরারে !"

জীবানন্দ। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজই এই স্তূপ শিখরে সন্তানেরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে সেই জিতিবে। বল, "বন্দেমাতরম্ !"

তখন কানন-প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া ধ্বনি উঠিল, "বন্দেমাতরম্"। ধীরে ধীরে সন্তান সেনা পর্বত শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্যনিনাদ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে শিখর দেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণীর সহিত ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে।

কিন্তু ইংরেজের কামানের "গুড়ুম গুড়ুম গুম" আঘাতে শত শত সন্তান হত-আহত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র সহিত টিলার উপর শুইল। চাষার কর্তনী সম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তান সেনা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথাই জীবানন্দ, বৃথাই মহেন্দ্র যত্ন করিতে



লাগিলেন। পতনশীল শিলা-রাশির ন্যায় সন্তান সেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পালায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশ সাধনের জন্য "হুররে!" "হুররে!" শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুত বেগে অসংখ্য অজেয় ব্রিটিশ-সেনা পলায়নপর সন্তান সেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রর সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস, এখানেই মরি।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম, বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নহে।"

জীবানন্দ। আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।

তখন পিছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, "কে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "অমন নহে। শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিবে না, তবে আমি একা চলিলাম।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম, লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টি মধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিলেন, বামহস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে "হরে মুরারে, হরে মুরারে!" যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। এ সাহসে কোন ফল নাই। তথাপি "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" গাহিতে গাহিতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্তি দেখিল; প্রথমে বিস্মিত হইল, তারপর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না?"

এই কথা শুনিয়া কতক সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানসেনা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে, সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তান সৈন্য মার মার শব্দে ফিরিয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজ সেনার মধ্যে একটা ভারি হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পালাইতেছে, গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরামুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তান সেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজ সেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন সন্তানগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। বল—হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

তখন "হরে মুরারে" ভীষণ ধ্বনিতে কানন-প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান 'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' রবে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় সর্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল। সেই সময়ে সন্তান সেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে সমুদ্র প্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

॥ অনুশীলনী ॥

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। সন্তান সেনাদের টিলায় চড়িবার আদেশ কে দিয়াছিলেন? কি কারণে তিনি তাহাদের লইয়া টিলায় চড়িতে চাহিয়াছিলেন?

২। জীবানন্দ গোস্বামী কিরূপে সন্তান সেনাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন? যুদ্ধে কাহাদের জয় হইল?

৩। জীবানন্দ গোস্বামীর বীরত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'যে আগে শিখরে উঠিবে সেই জিতিবে।'—কে, কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

২। 'কেহ আসিবে না, তবে আমি একা চলিলাম'—এই উক্তি কে, কখন, কোন্ পরিস্থিতিতে করিয়াছিলেন? এইরূপ উক্তি করিবার কারণ কি?

৩। 'ঐ দেখ শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে।'—বক্তা কে? সত্যানন্দ গোস্বামী কে? 'ধ্বজা' কথার অর্থ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম, বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নহে।'—কথাগুলির মর্ম লিপিবদ্ধ কর। এইরূপ বক্তব্যের দ্বারা বক্তার চরিত্রের কোন্ দিক প্রতিফলিত হইয়াছে আলোচনা কর।

২। 'ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।'—এই কথার অর্থ কি?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। বাক্য রচনা কর ঃ

টিলা, অনুকরণ, অবতরণ, পতনশীল, ধাবমান, মাভৈঃ, বিমোহিত।

২। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ পশ্চাৎ, অগ্রবর্তী, আনন্দ, বিক্ষিপ্ত।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

নীলাকাশপটে, জীবানন্দ, লোকান্তর, ইতস্ততঃ, মহেন্দ্র, সত্যানন্দ।

৪। সমাস নির্ণয় কর ঃ সন্তান সৈন্য, কানন-প্রান্তর, লৌহ বৃষ্টি, সমুদ্র প্রপাতবৎ; অশ্বপৃষ্ঠে, নীলাকাশপটে।

৫। অর্থ লিখ ঃ টিলা, স্তূপ, তূর্যনিনাদ, কর্তনী, সহস্র, লোকান্তর।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১. (ক) পাঠ্যাংশটি কোন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে? (খ) পাঠ্যাংশটির রচয়িতা কে? (গ) 'বন্দেমাতরম্' কথার অর্থ কি? (ঘ) সঙ্গীতটিকে আমরা জাতীয় জীবনে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছি?

২. (ক) 'মন্বন্তর' কাহাকে বলে? (খ) 'ওয়ারেন হেস্টিংস' কে ছিলেন? (গ) 'সন্ন্যাসী' কাহাদের বলা হয়? (ঘ) 'হরে মুরারে' কথার অর্থ কি? কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপ শব্দ প্রায়ই মুখে উচ্চারণ করে। (ঙ) 'সন্তান' কাহারা? (চ) 'গোঁসাই' কাহাদের বলে?

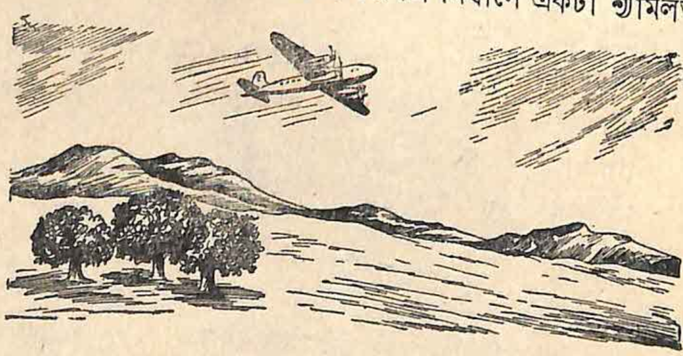
আকাশ পথে পারস্য যাত্রা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯৩২ সালের ১১ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ বিমান যোগে পারস্য ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহার পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কবি অমিয় চক্রবর্তী। এই অংশটি তাঁহার 'পারস্যে' নামক ভ্রমণ কাহিনী হইতে সঙ্কলিত।]

১১ই এপ্রিল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরোবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্য রাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এলো। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে।

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরোলুম তখন ভোর বেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ আকাশের নিচ দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছল ছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপারিগাছের ডাল দুলছে বাতাসে, লতাপাতা ঝোপ ঝাপের বিমিশ্র নিশ্বাসে একটা শ্যামলতার



গন্ধ। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চলল। কোথাও-বা দাগ-ধরা পুরানো পাকা দালান, তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া ; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ, শিবমন্দির জনশূন্য ; এবড়ো-খেবড়ো পোড়ো জমি ; পানা পুকুর ; ঝোপঝাড়। পাখিদের বাসায় তখনও সাড়া পড়ে নি। জোয়ার-

ভাঁটার সন্ধি-কালীন গঙ্গার মতো পল্লীর জীবনযাত্রা ভোর বেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

দমদমে উড়ো জাহাজের আড্ডা ওই দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনও রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জনে যন্ত্র পক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার-দোলা-ওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, পায়ের কাছে আমাদের পথে-ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাক্স। পাশে কাচের জানালা।

ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানা পুকুরের চারিধারে গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষ্ণা-সন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক।

মানুষ, পশু, পাখি কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না—শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন বিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠছে ততই পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র্য কতকগুলি আঁচড়ে এসে ঠেকল।

প্রায় দশটা এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনে জানালা দিয়ে দেখি নিচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিতলটা। খেচর রথ মাটিতে ঠেকল এসে, এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চারিদিক ধু ধু করছে রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হল না। এইখানে যন্ত্রটা পেট ভরে

তৈল পান করে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ যাত্রা শুরু। এতক্ষণ পর্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করিনি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি মেনিলা দ্বীপে আখের খেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটানো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্ছেন; ক্ষণে ক্ষণে চলছে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল। কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন করে পড়ছেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে।

জাহাজ ক্রমে উর্ধ্বতর আকাশে চড়ছে, হাওয়া চঞ্চল, তরী টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত শীত করে এল। নিচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখা-জালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবাভূমির নির্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্ণে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্র পাখির হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুনবার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে উপস্থিত, তখনই নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে।

পরের দিন ১০ই এপ্রিল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হল। হাওয়ার গতিক পূর্ব দিনের চেয়ে ভালোই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ক অন্ন ভোগ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ দিকে নীল জল, দক্ষিণে

পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়ফড়ানি। বহুদূর নিচে সমুদ্রে ফেনার সাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না শুনি গর্জন, না দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্নর বেতারে দূরলিপি যোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্কে পৌঁছল। সমুদ্র-তীরের মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপটা-ছাদের ছোট ছোট বাড়ি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক।

আকাশ যাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পদ কিছুই নেই। সেই জন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরিব মাটির পরে। কী সুগম্ভীর সূর্যাস্ত, কি তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান করে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়া ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন করে ধরলে।

পরদিন তিনটে-রাত্রে উঠতে হল, চারটার সময় যাত্রা। ১৩ই এপ্রিল তারিখে সকাল সাড়ে-আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছনো গেল।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ

১। আকাশ পথে পারস্য যাত্রার অভিজ্ঞতা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। বিমানে কবি কি করিয়া সময় কাটাইয়াছিলেন তাহা, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। সমুদ্রের ধার দিয়া যখন বিমান যাইতেছিল তখন তাঁহারা কি কি দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহা বল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার'—'দিনেমার' কোন্ দেশের লোককে বলে? তিনি কোথায় কি করিতেন? বিমানে যাইতে যাইতে তিনি কি করিতেছিলেন?

২। "করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্কে পৌঁছল"—'ব্যোমতরী' বলিতে কি বুঝান হইয়াছে? 'জাস্কে' কোথায় অবস্থিত? 'জাস্কে'র বর্ণনা দাও।

৩। "আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত"—কাহারা কাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? তাঁহারা কি করিয়াছিলেন?

৪। 'যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে'—কোন্ যন্ত্রের হুংকারের কথা বলা হইয়াছে? কথাবার্তা তলাইয়া যাইবার কারণ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'জোয়ার ভাটার সন্ধি-কালীন গঙ্গার মতো পল্লীর জীবনযাত্রা ভোরবেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে'—কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে? বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ কর।

২। 'নিচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখা জালে, অঙ্কিত যেন গেরুয়াপরা বিধবা ভূমির নির্জলা একাদশীর চেহারা'—কোন্ স্থানের বর্ণনা করা হইয়াছে? উপরোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ লিপিবদ্ধ কর।

৩। 'সেই জন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরিব মাটির দেশে। কী সুগম্ভীর সূর্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা।'—কোন্ স্থানের কোন্ সময়ের বর্ণনা করা হইয়াছে? বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। বাক্যরচনা কর ঃ

নিমন্ত্রণ ; অকর্তব্য ; আধা-শহুরে ; পরিত্যক্ত ; অনুভব ; তদারক ; তুফান।

২। অর্থ লিখ ঃ

সংকীর্ণ ; এবড়ো-খেবড়ো ; করুণ-মন্থর ; কেদারা ; বিস্তীর্ণ ; নিরস ; ইতস্তত ; বিক্ষিপ্ত ; পান্থশালা।

৩। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর ঃ

নীলাম্বু চুম্বিত ; সযত্ন-পক্কঅন্ন ; ব্যোমতরী ; শিবমন্দির, ঝোপঝাড়।

৪। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) **তারাখচিত** নিস্তব্ধ আকাশের নিচ দিয়ে… ।

(খ) **দেশ থেকে** বেরোবার বয়স গেছে… ।

(গ) **নিদ্রিত গ্রামের** আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে… ।

(ঘ) **শহর থেকে** জায়গাটা দূরে।

(ঙ) ক্রমে বেশ একটু **শীত শীত** করে এল।

[খ বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) পাঠ্যাংশটি কোন্ পুস্তকের অন্তর্গত ?

(খ) পাঠ্যাংশটির রচয়িতা কে ?

(গ) রবীন্দ্রনাথ আকাশপথে কোথায় যাইতেছিলেন ? তাঁহার সঙ্গে কে কে ছিলেন।

(ঘ) কোন্ সালের কোন্ তারিখে রবীন্দ্রনাথ পারস্য রওনা হইয়াছিলেন ?

(ঙ) 'খেচর রথ' কাহাকে বলা হইয়াছে ?

(চ) 'যোধপুর' কোথায় অবস্থিত ?

২। (ক) 'দিগঙ্গনার স্নেহ' বলিতে কি বুঝ ?

(খ) 'জাহাজটার ধড়ফড়ানি' কথার অর্থ কি ?

রাজদ্রোহী

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[বর্তমান পাঠ্যাংশটি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাস হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিনি এই অংশে এক রাজদ্রোহীকে ধরিবার জন্য পুলিস যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরাধীন দেশের দেশপ্রেমিক শাসক জাতির নিকট রাজদ্রোহী নামে পরিচিত হয়।]

ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ সাতজন পুলিশ-কর্মচারী সাদা পোশাকে পূর্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায় সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে।

জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিঙ ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটোছুটির অবধি নাই—হয়ত ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক-চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপ্‌সা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নিচে, জলে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে।

জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নিচে

আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একান্ত মনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়,—কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণতি প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুর্বিষহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই'ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার!

এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া

আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই। পালিয়েছে।

কি করে পালালো ?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানবো ত সে কি পালায় ? প্রায় শ'তিনেক যাত্রী, বিশ পঁচিশটা সাহেব, ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ'দেড়েক হবে, বাকী বর্মা—সে যে কার পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা' দেবা ন জানন্তি—বুঝলে না বাবাজী—আমরা ত পুলিস ? চেনবার জো নেই, তিনি বিলেতের কি বাংলার। কেবল সন্দেহ ক'রে জন ছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই,—সে নয়। যাবে না কি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে ?

অপূর্বের বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে। নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার কোরব ? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিসকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা' নয়। ভাল-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা' যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব।

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন কোরব কাকাবাবু ! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশি হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চল একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। অপূর্ব জেটির গায়ে দাঁড়াইয়া কাহার কথা ভাবিয়াছিল ? তাহার সম্বন্ধে কি কি কথা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল ?

২। নিমাইবাবু কে ? পুলিশ হইলেও নিমাইবাবুর চরিত্র কিরূপ ছিল আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। "যা ভয় করেছিলাম তাই। পালিয়েছে।"—এই উক্তি কে কাহার উদ্দেশে করিয়াছিলেন ? বক্তা কখন এমনি মন্তব্য করিয়াছিলেন ? তিনি কাহার পালাইবার কথা বলিয়াছেন ?

২। "ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন !"—'ভারতের' কিরূপ কল্যাণের কথা বলা হইয়াছে ? 'বিদ্রোহী শিকার' বলিতে কি বুঝাইতেছে ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না।'—কাহাদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা হইয়াছে ? তাহাদের কর্মধারার কিছু পরিচয় দাও।

২। 'তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও……সেই তো তোমার গৌরব।'—কাহার উদ্দেশ্যে এই বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ? অংশটি ব্যাখ্যা কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দগুলির অর্থ বল ঃ
করতলগত, স্বরূপ, বিস্মৃত, অগণতি, ফিরিঙ্গী, গুরুভার, অবিচ্ছিন্ন।

২। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ বিহ্বল, অশ্রুধারা, নিঃশব্দ, অত্যাচার, শীঘ্র, অগ্রদূত।

৩। সমাস নির্ণয় কর ঃ খেয়া-তরী, পাহাড়-পর্বত, ভাল-মন্দ, পদস্পর্শ।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) 'রাজদ্রোহী' কাহাকে বলে ? তুমি কোন রাজদ্রোহী দেখিয়াছ ?
(খ) 'খালাসী' কথার অর্থ কি ? তাহাদের কাজ কি ?
(গ) 'ইরাবতী নদী' কোথায় অবস্থিত ?
(ঘ) 'ফিরিঙ্গী' কাহাদের বলে ?

২। 'তিনি বিলেতের কি বাংলার'—অর্থ কি বুঝাইয়া বল।

জ্যোৎস্নায় বনভূমি

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর। 'পথের পাঁচালী' তাঁহার বিখ্যাত রচনা। ইহা ছাড়া অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, ইছামতী, মেঘমল্লার, অনুবর্তন, আদর্শ হিন্দু হোটেল, আরণ্যক প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচনা। বর্তমান পাঠ্যাংশটি তাঁহার 'আরণ্যক' উপন্যাস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।]

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে, সেদিন দোল পূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই। দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্যন্ত হেড অফিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে জিনিসটি আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

হয়ত যতদিন আসিয়াছি শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনও বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ প্রমোদের পরে ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথ রাত্রি। সে জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাট বন ঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্‌চকে সাদা বালি

মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্র অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন যেন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব--মন হুহু করিয়া উঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এইসব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়, আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধ্‌লি ফুল ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়; তখন কত জ্যোৎস্না শুভ্র রাত্রে, বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হইতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহাতো কখনো ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, এমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্ত বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত, যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। জ্যোৎস্নায় বনভূমির যে সৌন্দর্য বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য দেখিয়া লেখকের কি মনে হইল ? সর্বত্র কি এইরূপ জ্যোৎস্না দেখা যায় ?

৩। লেখক যে দিন জ্যোৎস্নার এইরূপ সৌন্দর্য দেখিয়াছিলেন, সে দিনটি কি দিন ছিল ? অন্যান্য লোকেরা তখন কি করিতেছিল ? সন্ধ্যাবেলা লেখক সেদিন একা একা কি করিতেছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। "একদিনের কথা জীবনে কখনো ভুলিব না"—কোন্ দিনের কথা ? জীবনে কখনও না ভুলিবার কারণ কি ?

২। "জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্না রাত্রি দেখা উচিত।"—কোন্ জ্যোৎস্না রাত্রির কথা বলা হইয়াছে ? এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। "জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না ''—পরীরাজ্য কাহাকে বলে ? মানুষের নিয়ম না খাটিবার কারণ কি ? অংশটির তাৎপর্য লিখ।

২। ''জীবনে একবার······রহিয়া গেল ?''—অংশটির ব্যাখ্যা কর। ভগবানের সৃষ্টি বলিতে কি বুঝ ?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১! অর্থ বল ঃ ছায়াবিহীন, হেড-অফিস, অবর্ণনীয়, অপার্থিব, পরীরাজ্য, প্রত্যক্ষ, উপলব্ধি, অপূর্ব, বিসর্পিত।

২। বাক্যরচনা কর ঃ অপরিচিত, সৃষ্টি, উঁকি, গভীর, জনহীন, হুহু।

৩। নিম্নরেখ শব্দগুলির পদ নির্ণয় কর ঃ
<u>এক</u> দিনের <u>কথা কখনও</u> ভুলিব না। মনে <u>আছে</u> সেদিন <u>দোলপূর্ণিমা</u>।

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ নিঃশব্দ, জ্যোৎস্নালোক, দিগন্ত, রূপলোক।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) পাঠ্যাংশটি কোন্ পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে ?

(খ) প্রথম অনুচ্ছেদটি যথাযথভাবে পাঠ কর।

(গ) 'হোলি' কি ?

(ঘ) 'কাছারি' কাহাকে বলে ?

(ঙ) 'সিপাহী' কাহাদের বলে ?

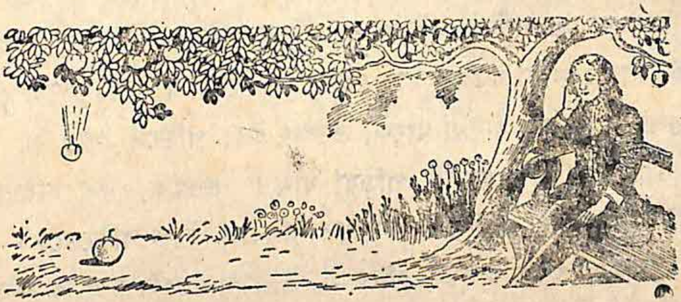
২। 'পরী' কাহাদের বলে ? ইহাদের কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়।

নিউটনের কীর্তি

—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

[নিউটন মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তত্ত্বটি কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু সহজভাবে কঠিন তত্ত্বকে এখানে পরিবেশন করিয়াছেন লেখক।]

তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, এমন সময় গাছ হইতে একটা



আপেল ফল নিচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয়ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু এই গল্প নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুত নিউটন ঐরূপ একটা কাজ কিছু করেন নাই।

তবে নিউটনের বাহাদুরী কিসে? অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে। নিউটনই প্রথম দেখিয়াছিলেন, যে ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন

দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে, অতএব প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয়ত আশ্চর্য হইবে। বলিবে,—কই চন্দ্র ত কতদিন আমাদের মাথার উপরে উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কই ?

কিন্তু আশ্চর্য হইও না। চন্দ্র বস্তুতঃ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। যে-দিন চন্দ্রের সৃষ্টি সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে, এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙিবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্বমুখে

বেগটুকু না থাকিত তাহা হইলে চন্দ্র একদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত। তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মত প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই হয়ত ভাঙিয়া যাইত।

নিউটনই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকে ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানি গাছের চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপে পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার যো নাই।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। নিউটন কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ? এ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটি কি ?

২। সাধারণ লোকের দেখা ও নিউটনের দেখার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। চন্দ্র আমাদের মাথায় ভাঙিয়া পড়ে না কেন ? এই সম্বন্ধে নিউটনের উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়'—এই বাক্যটি কোন্ প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে ?—'লাভ হয়' দ্বারা লেখক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?

২। 'গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে'—এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'উভয়ের প্রতি উভয়ের টান সমান'—উভয় বলিতে কাহাদের বুঝান হইয়াছে ? বাক্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

২। 'কলুর বলদ……চারিদিকে ঘুরিতেছে'—কলুর বলদ ও ঘানিগাছ কাহাকে বলে? বাক্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লিখ ঃ

মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, বাহাদুরী, দূরস্থিত, বস্তুতঃ, বেষ্টন, স্বস্থান, অব্যাহতি।

২। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ

স্থির, খ্যাতি, প্রকাণ্ড, দূরস্থিত, শক্ত, সৃষ্টি, লাভ।

৩। মোটা হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) অন্য **লোকে** দেখে ফলটা **পৃথিবীর** দিকে যাইতেছে। (খ) নারিকেলটা যতক্ষণ **গাছ হইতে** না খসে……। (গ) চন্দ্র আমাদের **পৃথিবী হইতে** অনেক দূরে আছে।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) নিউটন ও আপেলের গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বল।

(খ) নিউটন কোন্ দেশের লোক ছিলেন?

(গ) 'মাধ্যাকর্ষণ' কাহাকে বলে?

(ঘ) 'কলুর বলদ' কি? এই বাক্যাংশটির অন্য কি অর্থ হয় বল।

(ঙ) 'ঘানিগাছ' কি?

২। (ক) চন্দ্র কতদিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে?

(খ) চন্দ্র পৃথিবীর উপর পড়িলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইত?

(গ) চন্দ্র কেন পৃথিবীর উপর আছড়াইয়া পড়ে না?



শৈশবের স্মৃতি

—শিবনাথ শাস্ত্রী

[শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক। আলোচ্য পাঠের অংশটি লেখকের 'আত্মচরিত' গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। লেখক এইখানে শৈশবের নানা কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার বাস্তব ও সরস বর্ণনা দিয়াছেন।]

আমি শৈশবে পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম ; পুষি নাই এমন জন্তু নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দ'য়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া ও-সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দূর্বার ঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভাল লাগিত যে, আমি যখন ছয় সাত বৎসরের ছেলে, তখনও পিঁপড়ে হইয়া চারি হাত পায় পিঁপড়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। মাছি মারিয়া, খ্যাংরা কাঠির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া সেই কাঁটাদ্বারা সেই মাছি আবার মাটিতে পুঁতিয়া দিতাম ; দিয়া কখন পিঁপড়ে আসিয়া মাছি ধরিয়া টানাটানি করিবে সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। হয়ত আধঘণ্টা পরে সেখানে একটি পিঁপড়ে দেখা দিল। সে প্রথমে আসিয়া মাছিটির পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। যখন দেখিল সহজে টানিয়া লইতে পারে না, তখন চারদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমার খ্যাংরা কাঠিটির উপরে একবার ওঠে, একবার নামে, বড়ই ব্যস্ত। অবশেষে সে চলিয়া গেল, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গুড়ি মারিয়া চলিলাম। সে গিয়া গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমি দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আরও

আধঘন্টা গেল। শেষে দেখি, সৈন্যদল বাহির হইল। পিঁপড়ের সারি; মধ্যে মধ্যে দুইটা করিয়া বলবান্, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি পিঁপড়ে। পরে ভাবিয়াছি তাহারা সেনাপতি হইবে। প্রকাণ্ড সৈন্যদল ক্রমে আমার মাছির নিকট উপস্থিত; তখন মহা টানাটানি আরম্ভ হইল। অবশেষে আমি খ্যাংরা কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। তখন মাছি লইয়া সকলে গর্তের দিকে দৌড়িল। ইহারা ফিরিতেছে, তখন অপরেরা আসিতেছে, পথে মুখোমুখি করিয়া কি সংকেত করিল যে, যাহারা আসিতেছিল তাহারাও ফিরিল। আমি মনে করিতাম, ইহারা নিশ্চয় কথা কয়। তখন মাটির নিকটে কান পাতিয়া রহিতাম, তাহাদের শব্দ শোনা যায় কি না। কান পাতিয়া আছি, তখন কেহ শব্দ করিলে বারণ করিতাম, "চুপ কর, চুপ কর, পিঁপড়েরা কি বলছে শুনি।" ইহা দেখিয়া বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করিতেন। এই ব্যাপার প্রায় সর্বদাই ঘটিত।

তৎপরে, পাখি ধরিবার ও পুষিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ ছিল। পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম, আনিয়া তাহার মায়ের মত যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। সে জাতীয় পাখিরা কি খায়, তাহাদের মায়েরা কিরূপে খাওয়ায় এ-সকল সংবাদ পাড়ার ডানপিটে ছেলেদের কাছে পাইতাম; সেইরূপ করিয়া দিনের মধ্যে দশবার করিয়া খাওয়াইতাম। হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া, তাহার মধ্যে কুটিকাটি দিয়া বাসা বাঁধিয়া তাহার মধ্যে বাচ্চা রাখিতাম। রাখিয়া একখানা সরা দিয়া ঢাকিয়া হাঁড়িটি ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখিতাম, পাছে সাপে খাইয়া যায়। তারপর খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া, অগ্রভাগের পাতাগুলি চিরিয়া খ্যাংরার মত করিতাম, তাহাকে বলে "ছাট"। সেই ছাট হাতে করিয়া মাঠে মাঠে ঘাস-বনে ফড়িং ধরিতে যাইতাম। ঘাসের উপর ছাটগাছি বুলাইলেই ফড়িং লাফাইয়া উঠিত। অমনি সেই ছাট তাহার পৃষ্ঠদেশে মারিয়া তাহাকে অর্ধমৃত প্রায় করিতাম। সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাহাকে এক বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে

পুরিতাম। এইরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফড়িং ধরিতাম, ধরিয়া আনিয়া পাখিকে খাওয়াইতাম। পাখির বাচ্চা পোষা প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইত। বাবা তখন ছুটিতে বাড়িতে থাকিতেন। তিনি আমার পাখি পোষা দেখিতে পারিতেন না। পাখির বাচ্চাকে খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমাকে ঐ বাচ্চার মায়ের কাজ করিতে হইত। পিতার হস্তে এত প্রহার খাইয়াও কিরূপে আমি তাহাদিগকে পালন করিতাম, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

মা আমার পাখি পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না। বোধ হয়, ছেলে বাড়িতে থাকে এবং একটা কাজে ভুলিয়া থাকে, এই তাঁহার মনের ভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারও পাখি পোষার সখ ছিল। আমি চলিয়া আসিবার পরও তিনি অনেক পাখি পুষিয়াছেন।

আমি কেবল পাখির বাচ্চা পুষিতাম তাহা নহে, ধাড়ি পাখিও পুষিতাম। বড় পাখি ধরিবার তিন প্রকার কৌশল ছিল। প্রথম—আমাদের উঠানে একটি ধামা খাড়া করিয়া তাহার সম্মুখে চাল-কলাই ছড়াইয়া ধামার পৃষ্ঠে একগাছি বাঁকারির অগ্রভাগ লাগাইয়া, অপর প্রান্ত দাবাতে লাগাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোন ঘুঘু বা পায়রা বা শালিক যেই আসিয়া একমনে চাল-কলাই খাইত, অমনি বাঁকারির দ্বার ধামাটি ঠেলিয়া তাহাকে ধামা চাপা দিতাম। দ্বিতীয়—গাছের ডালে যখন পাখিতে পাখিতে ঝগড়া ও মারামারি করিত, তখন তাহার নিচে গিয়ে কাপড়ের জাল পাতিতাম। তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়াজড়ি করিয়া পাকা ফলটির মত গাছের তলায় পড়িয়া যায়। কখনও কখনও ঐরূপে আমার কাপড়ে পড়িয়া যাইত। তৃতীয়—টুনটুনি, দ'য়েল প্রভৃতি পাখিরা যখন অন্যমনস্কভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকিত, তখন ভোঁ করিয়া তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল মারিতাম। হঠাৎ তাহাদের পায়ের নিকটস্থ ডালে সজোরে ঢিল লাগাতে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়া যাইত ; আমি অমনি তাহাদিগকে ধরিতাম।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। লেখক কেমন করিয়া পিঁপড়েদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন ?

২। শিবনাথ শাস্ত্রী কেমন করিয়া বাল্যকালে পাখি ধরিতেন ?

৩। 'শৈশবের স্মৃতি' অবলম্বনে বাল্যকালে লেখকের মনের নিষ্ঠুরতার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল'—কিরূপে লেখক ফড়িং ও পিঁপড়ে পুষিতেন তাহা বল।

২। "ইহা দেখিয়া বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করিতেন"—কি দেখিয়া ? হাসিবার কারণ কি ?

৩। "পাখি ধরিবার তিনটি কৌশল ছিল"—কৌশলগুলি কি কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। "তাহারা মারামারি করিবার সময় রাগে এমন অন্ধ হয় যে, দুজনে জড়াজড়ি করিয়া পাকা ফলটির মত গাছের তলায় পড়িয়া যায়।"—কাহাদের কথা বলা হইয়াছে ? বাক্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। কারক এবং বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) **পাখির বাচ্চাকে** খাওয়াইতে দেখিলেই আমাকে মারিতেন।

(খ) তখন **মাটির নিকটে** কান পাতিয়া রহিতাম।

(গ) বাবা তখন ছুটিতে **বাড়িতে** থাকিতেন।

২। অর্থ বল ঃ ছাট, প্রদক্ষিণ, ধাড়ি, বাঁকারি, কোঁড়।

৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ পৃষ্ঠদেশ, দিশাহারা, পরীক্ষা।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) পাঠ্যাংশটি লেখকের কোন্ পুস্তক হইতে গৃহীত ?

(খ) পাঠ্যাংশে কি কি পাখির নাম আছে ?

(গ) মা পাখি পোষার বড় বিরোধী ছিলেন না কেন ?

(ঘ) কোন্ কোন্ মাসে পাখির বাচ্চা পোষা আরম্ভ হইত ?

(ঙ) লেখকের পাখি ধরিবার একটি গল্প বল।

২। (ক) 'ডানপিটে' কথার অর্থ কি ?

(খ) 'ছাট' ও 'বাঁকারি' কাহাকে বলে ?

বাঙালীর কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

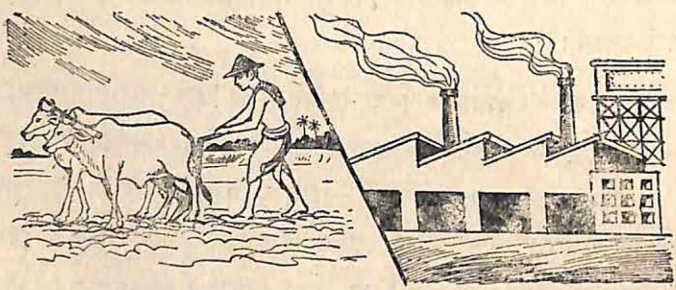
—মহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

[বাঙালী শিল্পে ও বাণিজ্যে অনগ্রসর—এই কারণেই বাঙালীর দুর্দশা। লেখক এখানে, কিভাবে বাঙালীকে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে সেই নির্দেশ দিয়াছেন।]

অতীতে বাংলা প্রধানত কৃষিকার্যোপযোগী ছিল ; আজিও অনেকে মনে করেন যে, নদীমাতৃক এই শ্যামল ভূমিটি একমাত্র কৃষির উপযোগী ক্ষেত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বাংলার বক্ষে নানাবিধ শিল্পালয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ও তাহাদের অনেকগুলিই বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয়, কোন বিশিষ্ট গঠনমূলক জাতীয় পরিকল্পনা লইয়া এই শিল্পালয়গুলি স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে এইগুলির উদ্ভব হওয়ায় ইহাদের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের অভাব রহিয়াছে। জাতীয় প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া এইগুলিকে স্থাপন করিতে হইলে, দেখা প্রয়োজন কাছাকাছি যাহারা অবস্থান করিবে, তাহারা যেন পরস্পরের সহায় হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে উহাদের কোনোটিই আশানুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে না। এইরূপ বিবেচনার অভাব বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই বলিলাম যে, ইহারা কোনো জাতীয় পরিকল্পনার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কৃষিপ্রধান বাংলার মাটিতেও শিল্পালয়ের জন্য যথেষ্ট সুবিধা বর্তমান।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি ও শিল্পকার্য পরস্পর বিরোধী নহে। ইহাদের একটি অপরের সহায়। অতএব, শিল্পোন্নতি যেমন কৃষি ফলনের অধিকতর উৎপাদনের মুখাপেক্ষী, তেমনই বর্তমান যুগে শিল্প-

প্রধান দেশ তাহাদের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে উন্নততর সার দিয়া ও আধুনিকতম লাঙল দ্বারা চাষ করিয়া আশ্চর্যরূপে অধিক ফলন ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। বাংলাদেশে ফসলের পরিমাণ ক্রমাগত প্রতি বৎসরই কমিয়া যাইতেছে। এই ক্ষতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া আমাদের কৃষি-



ক্ষেত্রকে অধিকতর উপযোগী করা বাঞ্ছনীয়। কৃষিকার্যের দ্বারা বহুবিধ ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে একাধিক শিল্পালয় গঠিত হইতে পারিবে। কাজেই আমার মনে হয় যে, প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশই শিল্প ও কৃষিকার্য উভয়ের জন্যই উপযুক্ত।

বাঙালী জাতিকে ভাবপ্রবণ বলিয়া সকলেই উপহাস করে। কথাটাকে মিথ্যা বলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, তবে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও মন রাজী হয় না।

একথা অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে যে, দীর্ঘকালের কর্মবিমুখতার কুফল বাঙালী এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। তাহাকে খাদ্যের জন্য আজ যেমন বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে, বস্ত্রের জন্য তেমনি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী। বাংলার জন্য মাখন আসিবে অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড ও আলিগড় হইতে। তাহার জন্য রুটি প্রস্তুত হইবে—যুক্তপ্রদেশ কিংবা পাঞ্জাবের গমের সাহায্যে। তাহার বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র থাকিতেও আজ যে, সমস্ত দেশে দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে,

তাহাও তাহার নিবু'দ্ধিতার দোষেই। আশা করি শীঘ্রই তাহার মধ্যে কর্মবিমুখতার পরিবর্তে কার্যতৎপরতা দেখা দিবে।

অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীকে নিশ্চয়ই অধিকতর পরিমাণে ব্যবসার ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর চাকুরীজীবন আর কেরানীকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারিবে না। তাহাকে অধিকতর অর্থ উপার্জন করিতে হইলে শিল্পালয়ে যোগ দিতেই হইবে। ইহা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশের শিল্পালয়গুলির ত্রুটি কি ?

২। দীর্ঘকালের কর্মবিমুখতার জন্য বাঙালীদের কি কি অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে ?

৩। বাঙালীর বর্তমান দুর্দশা হইতে মুক্তি পাইবার কি উপায় লেখক বলিয়াছেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে উহাদের কোনোটিই আশানুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে না'—কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হইয়াছে ? উক্তিটির অর্থ বুঝাইয়া দাও।

২। 'পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ উদাহরণের অভাব নেই'—কোন্ উদাহরণের কথা বলা হইয়াছে ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'বাঙালী জাতিকে ভাবপ্রবণ বলিয়া সকলে উপহাস করে'—বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ লিখ।

২। 'সমস্ত দেশে দারুন হাহাকার উঠিয়াছে, তাহাও তাহার নিবু'দ্ধিতার দোষে' —কাহার নিবু'দ্ধিতার দোষের কথা বলা হইয়াছে ?—বাক্যটির তাৎপর্য লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। সন্ধি কর ঃ

কার্য + উপযোগী, শিল্প + আলয়, পরঃ + পর, আশা + অনুরূপ, শিল্প + উন্নতি, ক্রম + আগত, এক + অধিক, গতি + অন্তর।

২। অর্থ লিখ ঃ

কৃষিকার্যোপযোগী, নদীমাতৃক, সমৃদ্ধ, পরিকল্পনা, উদ্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বী, মুখাপেক্ষী, কুশলী, উপহাস, কর্মবিমুখতা, মধ্যবিত্ত, গত্যন্তর।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) বাংলাদেশ মূলতঃ কি নির্ভর ?

(খ) আমাদেশের শিল্পের প্রসারের সুবিধা কি ?

(গ) 'পাশ্চাত্যদেশ' বলিতে কোন দেশ-কে বুঝায় ?

(ঘ) বাঙালী কর্মবিমুখতার কুফল কিভাবে বুঝিতে পারিতেছে ?

(ঙ) 'কর্মতৎপরতা' বলিতে কি বুঝ ?

২। অর্থ উপার্জন করিতে হইলে এবং বেকারিত্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে-গেলে বাঙালীকে কি করিতে হইবে ?

ভার্সাই শহরে মধুসূদন

—বনফুল

[নাট্যাংশটি 'বনফুলের' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) শ্রীমধুসূদন নাটক হইতে গৃহীত।]

ভার্সাই শহরে একটি স্বল্পালোকিত কক্ষ। একটি সাধারণ টেবিল ও কয়েকটি শ্রীহীন চেয়ার ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। দীন বেশে মধুসূদন অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন। বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মধুসূদন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন এবং সভয়ে চাহিয়া রহিলেন। কড়া নাড়া সমানে চলিতে লাগিল।

মধু। (শুষ্ক সভয় কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি) হেনরিয়েটা!

[পাশের ঘর হইতে হেনরিয়েটা বাহির হইয়া আসিলেন]

বোধহয় কোন পাওনাদার এসেছে। (অসহায়ভাবে) কি করি?

হেনরিয়েটা। তুমি ভেতরে যাও, আমি কথা কইছি।

[কড়া নাড়ার শব্দ উগ্র হইল। একটু ইতস্তত করিয়া মধুসূদন পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। হেনরিয়েটা আগাইয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দিতেই মনোমোহন ঘোষ প্রবেশ করিলেন।]

মনোমোহন। বউদি যে!

হেনরিয়েটা। ও আপনি! আসুন।

মনোমোহন। আপনারা লণ্ডন থেকে হঠাৎ চলে এলেন যে?

[মনোমোহনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পাশের ঘর হইতে মধুসূদন সোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিলেন।]

মধু। মনু—তুমি! এখানে কি মনে করে? অ্যাঁ—ব'স—ব'স।

[হেনরিয়েটা ভিতরে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন ও মনোমোহন উপবেশন করিলেন।]

মনোমোহন। আই. সি. এস. ফেল করে ভাবলাম, কি আর করি, আপনার কাছে একটু বেড়িয়ে যাই। (হাসিলেন)

মধু। তুমি ফেল করেছ? I am so sorry, সত্যেনের খবর কি?

মনোমোহন। সত্যেন পাশ করেছে।

মধু। আমার ধারণা ছিল সত্যেনের চেয়ে তুমি ঢের বেশি বুদ্ধিমান। (সান্ত্বনার সুরে) এবারে তুমি ল্যাটিন ও ইটালিয়ান নাও।

মনোমোহন। পারব কি?

মধু। কেন পারবে না? ভাষা শেখা খুবই সহজ। এখানে আমি ফ্রেঞ্চটা তো প্রায় শিখে ফেললাম। এবার জার্মান, স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ আরম্ভ করব ভাবছি।

মনোমোহন। আজকাল লিখছেন না কিছু?

মধু। Oh yes; বাংলা সনেট লিখছি। শুনবে?

[ডেস্ক হইতে খাতা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।]

চন্দ্রচূড় জটা জালে আছিল যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন
একটু অপেক্ষা কর।

[মধুসূদন চুপ করিয়া রহিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল]

মনোমোহন। পড়ুন আপনি।

[মধুসূদন বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন]

বউদি আসবার পর আপনি লণ্ডন থেকে চলে এলেন যে হঠাৎ?

মধু। ধারের জন্য। হাতে একটি পয়সা ছিল না, ধার না করেই বা কি করি! তার উপর তোমার বউদি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে পড়লেন—বাধ্য হয়ে লণ্ডন ছেড়ে পালাতে হ'ল। ভাবলাম, এই পাড়াগাঁয়ে কম খরচে কুলুতে পারব—কিন্তু এখানেও কুলুতে পারছি না ভাই।

মনোমোহন। আপনার টাকা কি আসছে না?

মধু। কিছুই না—চারিদিকে কেবল ধার আর ধার—শোধ করতে না পারলে ফ্রেঞ্চ জেল অনিবার্য।

মনোমোহন। কি যে বলেন! আপনার টাকা আসছে না কেন? আপনার পৈতৃক সম্পত্তি তো সব উদ্ধার হয়েছে শুনেছি।

মধু। সব উদ্ধার হয়েছে? কিন্তু যাদের উপর ভার দিয়ে এসেছি তারা একটি পয়সাও পাঠাচ্ছে না। হেনরিয়েটাকে মাসে মাসে খরচ দেবার কথা ছিল, কিন্তু দেয় নি। বেচারা নিরুপায় হয়ে শেষে এখানে পালিয়ে এসেছে।

মনোমোহন। এরকম ব্যবহার করছে কেন তারা?

মধু। কারণ তারা ধূর্ত!

[উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। তারপর সহসা ঘুরিয়া]

আমাকে বাঁচতে হবে—ব্যারিস্টার হতে পারি আর না পারি—

[একটা কাগজের মোড়া পুলিন্দা বগলে করিয়া হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন]

হেনরিয়েটা। আমি একটু বেরুচ্ছি।

মধু। কোথায় যাচ্ছ এ সময়? হাতে ওটা কি?

হেনরিয়েটা। (ম্লান হাসিয়া) ও কিছু নয়।

মধু। কি নিয়ে যাচ্ছ দেখি? মনুকে লুকোবার দরকার নেই; সব কথা বলেছি ওকে।

[হেনরিয়েটা নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মধুসূদন পুলিন্দাটা খুলিয়া দেখিলেন, একটি সুদৃশ্য গাউন বাহির হইল—]

এইটে নিয়ে যাচ্ছ। এটা যে তোমাকে বিয়ের পরে আমি প্রথম দিয়েছিলাম।

হেনরিয়েটা। ঘরে খাবার নেই।

মধু। তা হোক। আমি প্রত্যেক ডাকেই টাকা আসবে আশা করছি।

হেনরিয়েটা। (বিস্মিত) কে পাঠাবে!

মধু। আমি যাঁর কাছে টাকার জন্য লিখেছি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে

তিনি প্রাচীন ঋষিদের মত, কর্মদক্ষতায় তিনি য়ুরোপীয় এবং তাঁর হৃদয় বাঙালী মায়ের মত।

মনোমোহন। আপনি বিদ্যাসাগরের কথা বলছেন ?

মধু। Yes, বিদ্যাসাগর the great.

[দুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মনোমোহন কপাট খুলিয়া দিতেই পিওন প্রবেশ করিল এবং একটি রেজিস্টার্ড খাম মধুসূদনের হাতে দিল।]

এসেছে—এসেছে—এসেছে—টাকা এসেছে।

[উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ হস্তে খামটা তুলিয়া শিশুর মতো নৃত্য করিতে লাগিলেন—]

—যবনিকা—

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। মধুসূদন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকিত হইয়াছিলেন কেন ? বিদেশে কে তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়াছিলেন ?

২। ভার্সাই শহরে মধুসূদনের যে অভাব অনটনের চিত্র এই অংশে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'Oh yes ; সনেট লিখছি। শুনবে'—এই উক্তি কে কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছেন ? সনেট কি ? যে কয়লাইন সনেটের উল্লেখ এখানে রহিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ কর।

২। 'এসেছে—এসেছে—এসেছে'—এই উক্তি কাহার ? কি আসিয়াছে ? যাহা আসিয়াছে তাহা কে পাঠাইয়াছে ? যিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে বক্তার মনোভাব কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। "আমি যাঁর কাছে টাকার জন্য লিখেছি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে তিনি প্রাচীন ঋষিদের মত, কর্মদক্ষতায় তিনি য়ুরোপীয় এবং তাঁর হৃদয় বাঙালী মায়ের মত"—কাহার প্রসঙ্গে এই কথাগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে? বাক্যটির ব্যাখ্যা কর।

২। চন্দ্রচূড় জটা জালে আছিল যেমতি
জাহ্নবী, ভারতরস ঋষি দ্বৈপায়ন—কোন্ প্রসঙ্গে কথাগুলি বলা হইয়াছে? পঙক্তি দুইটির অন্তর্নিহিত অর্থ লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। অর্থ লিখ ঃ

পুলিশ, চন্দ্রচূড়, নিরুপায়, গাউন, কর্মক্ষমতা।

২। সমাস নির্ণয় কর ঃ

চন্দ্রচূড়, জটাজাল, ভারতরস।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

ইতস্তত, সোচ্ছ্বাস, কণ্ঠস্বর, উদ্ধার, বিদ্যাসাগর।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) পাঠ্যাংশটি কোন নাটকের অন্তর্গত?
(খ) মধুসূদনের স্ত্রীর নাম কি? তিনি কোন দেশের মহিলা ছিলেন?
(গ) আই. সি. এস. কথার অর্থ কি?
(ঘ) 'সনেট' কাহাকে বলে?
(ঙ) 'দ্বৈপায়ন' কে ছিলেন? তাঁহার রচিত কাব্যের নাম কি?

২। (ক) 'গাউন' কাহাকে বলে?
(খ) 'ব্যারিস্টার' কাহাদিগকে বলে?
(গ) 'পুলিন্দা' কথার অর্থ কি?
(ঘ) হেনরিয়েটা কোন গাউন লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন?
(ঙ) 'লণ্ডন' কোথায় অবস্থিত।

মহাস্থবির শীলভদ্র

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্র, ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই বাঙালী পণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমান পাঠ্যাংশে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।]

গয়া থেকে কিছু দূরে বিহার-লাইট-রেলওয়ের বড়গাঁ বলে একটা ছোট্ট স্টেশন আছে। সেই বড়গাঁ গ্রামের দক্ষিণে মাটির তলা থেকে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

এত বড় শিক্ষাকেন্দ্র ভারতে আর হয় নি এবং জগতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রধান যে-সব শিক্ষা-কেন্দ্র আছে, নালন্দার নাম তাদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। দেশ-দেশান্তর থেকে, সমুদ্র পেরিয়ে, হিমালয়ের মত পাহাড় উল্লঙ্ঘন করে, দলে দলে ছাত্র আসতো, নালন্দায় অধ্যয়ন করবার জন্যে।

আজ নালন্দার দীর্ঘ ইতিহাসের যে-সময়কার কাহিনী বলছি, সে-সময় নালন্দার গৌরবের যুগ। দশ হাজার ছাত্র তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে অধ্যয়ন করেন। এত বড় বাসোপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় জগতে আর হয় নি। নালন্দার যিনি অধ্যক্ষ হতেন, ভারতের যে-কোন প্রদেশের রাজা তাঁর কাছে মাথা নত করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

এই মহা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ছিলেন, প্রাচীন ভারতের সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত, নালন্দা মহা-বিহারের অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্রের কাহিনী এখানে তোমাদের বলবো।

তিনি ছিলেন সমতটের রাজার ছেলে। প্রাচীনকালে বাংলার

দক্ষিণভাগকে সমতট বলতো। রাজার ছেলে হয়ে সিংহাসন ছেড়ে তিনি পায়ে হেঁটে বেরোলেন জ্ঞান সংগ্রহের জন্য।

সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে-হেঁটে পরিভ্রমণ করে, সেখানে যা কিছু শিক্ষণীয় পেয়েছিলেন, সমস্ত শিক্ষা করে, ত্রিশ বছর বয়সে একদিন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল। বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক-রূপে তিনি নালন্দা মহা-বিহারে যোগদান করে জ্ঞান-দাতা ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করলেন। সমতটের রাজসিংহাসন পড়ে রইলো দূরে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অবশিষ্ট সমস্ত শাস্ত্র-অধ্যয়ন শেষ করলেন। বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যায় তিনি বোধিসত্ত্ব ধর্মপালের মতই বরণীয় হয়ে উঠলেন। সেই সময় দক্ষিণ ভারত থেকে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নালন্দার বৌদ্ধ অধ্যক্ষের সঙ্গে তর্ক করবার জন্যে মগধের রাজ-



দরবারে উপস্থিত হন। তিনি ধর্মপালকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। রাজা ধর্মপালকে ডেকে পাঠালেন। ধর্মপাল তর্কযুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে যখন যাবার উদ্যোগ করছেন, তখন শীলভদ্র এসে বললেন, আপনি কেন যাবেন?

ধর্মপাল উত্তর দিলেন, বৌদ্ধধর্মের সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে, চারিদিকে বিধর্মীরা মেঘের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দূর না করতে পারলে স্বধর্মের উন্নতি নেই।

শীলভদ্র তাঁকে নিরত করে বললেন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনি থাকুন ; আপনার পরিবর্তে আমি যাচ্ছি !

ধর্মপাল সম্মত হওয়াতে শীলভদ্র তাঁর প্রতিনিধিরূপে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার-যুদ্ধের জন্যে মগধের রাজসভায় উপস্থিত হলেন।

শীলভদ্রকে দেখে বৃদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হেসে উঠলেন, এই বালকের সঙ্গে কি বিচার করবো !

কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এ রকম অবস্থা হলো যে, সেই বালকের কোনও যুক্তি তিনি খণ্ডন করতে পারেন না, কোনও কথার উত্তর দিতে পারেন না। অবশেষে লজ্জায় অধোবদনে তিনি রাজসভা ত্যাগ করে গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হয়ে মগধের রাজা বললেন, আপনার পাণ্ডিত্যে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনাকে আপনার পাণ্ডিত্যের অর্ঘস্বরূপ একটি নগর দান করছি। আপনি গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন !

জ্ঞান-ব্রত শীলভদ্র মৃদু হেসে বললেন, মহারাজ, আমি কাষায় গ্রহণ করেছি, আমি আপনার নগর নিয়ে কি করবো ?

কাতর হয়ে রাজা বললেন, ভগবান বুদ্ধ বহুদিন গত হয়েছেন। এখন যদি গুণের পূজা না করি, তাহলে ধর্মরক্ষা পাবে কি করে ? আপনি আমার এ দান অগ্রাহ্য করবেন না !

রাজাকে এতদূর আগ্রহশীল এবং কাতর দেখে শীলভদ্র সেই নগর গ্রহণ করলেন। নগরটা গ্রহণ করে তার রাজস্ব দিয়ে একটি বিরাট সঙ্ঘারাম নির্মাণ করালেন এবং সেই নগরের আয় থেকে তাহা পরিচালিত হতে লাগলো।

শীলভদ্র নিজে জ্ঞান আহরণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর অন্তরে আরও মহত্তর আদর্শ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, জ্ঞানের

মধ্য দিয়ে দেশ-দেশান্তর সম্মিলিত হোক। মানুষের তৈরি করা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য জ্ঞানের স্পর্শে দূর হয়ে যাক্। এই যে আদর্শ, একে আমরা বলি আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমৈত্রী। শীলভদ্র ছিলেন প্রাচীন জগতের আন্তর্জাতিকতার একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এই পাঠে যাহা জানিতে পারিয়াছ তাহা লিখ।

২। শীলভদ্র প্রথমে কে ছিলেন? তিনি কেন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন?

৩। শীলভদ্র কাহার নিকট বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা ও শিক্ষা পাইয়াছিলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'সমতটের রাজসিংহাসন পড়ে রইলো দূরে'—'রাজসিংহাসন দূরে পড়ে রইল' অর্থ কি? কে কেন রাজসিংহাসন দূরে ফেলিয়া রাখিলেন?

২। 'মহারাজ আমি কাষায় গ্রহণ করেছি, আমি আপনার নগর নিয়ে কি করবো।'—এই উক্তি কে, কখন, কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? তিনি নগর লইয়া কি করিলেন?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন :

১। 'বৌদ্ধধর্মের সূর্য অস্তমিত……স্বধর্মের উন্নতি নেই।'—এই উক্তি কাহার, বাক্যটির ব্যাখ্যা কর।

২। 'এখন যদি গুণের পূজা না করি, তাহলে ধর্মরক্ষা পাবে কি করে?'—কে, কাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন? কথাগুলির অর্থ কি?

৩। 'মানুষের তৈরি করা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য জ্ঞানের স্পর্শে দূর হয়ে যাক্।'—বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। বিভক্তির চিহ্নগুলি বাহির কর ঃ

ভারতের, জগতে, দক্ষিণভাগকে, তর্কযুদ্ধে, বিধর্মীরা।

২। শুদ্ধ শব্দটি বাহির করিয়া লিখ ঃ

পাহার—পাহাড় ॥ কাহীনি—কাহিনী ॥ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ॥ অধ্যক্ষ্য—অধ্যক্ষ ॥ বরনীয়—বরণীয় ॥ সূর্য—সুর্য ॥ সম্মত—সন্মত।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

সিংহাসন, হিমালয়, দিগ্বিজয়ী।

৪। অর্থ বল ঃ

কাষায়, দিগ্বিজয়ী, বিশ্বমৈত্রী, সমতট, অধ্যক্ষ, মহাস্থবির।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) 'নালন্দা' কোথায় অবস্থিত, এবং কি জন্য বিখ্যাত? কিভাবে সেখানে যাওয়া যায়?

(খ) 'শীলভদ্র' কে ছিলেন? তিনি কাহাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন?

(গ) 'সমতট' কোন অঞ্চলকে বলা হইত?

(ঘ) শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে মগধের রাজা কি বলিয়াছিলেন?

(ঙ) শীলভদ্র নগর লইয়া কি করিলেন?

২। আন্তর্জাতিকতা কি? বিশ্বমৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতা কি এক?

অন্ন যোগায় কে ?

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

[মারাঠা নেতা শিবাজীর গুরু ছিলেন সর্বত্যাগী ভিক্ষুক রামদাস। রামদাস সারা দেশে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করিতেন। কিন্তু রাজ-অন্ন গ্রহণ করিতেন না। শিবাজীর মনে একবার অহংকার জন্মিয়াছিল॥ সে অহংকার গুরু রামদাস কিভাবে চূর্ণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী এখানে বলা হইয়াছে।]

শিবাজী আর তাঁর সন্ন্যাসী-গুরু রামদাসের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ।

রামদাস স্বামী শুধু একজন বড় সাধকই ছিলেন না—সংসার এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। শিবাজী নানা বিপদে আপদে বহুবার তাঁর কাছে ছুটে গেছেন পরামর্শের জন্যে আর সৎ-পরামর্শই পেয়েছেন—একথা ইতিহাসে লেখা আছে। তবে শিবাজীর বহু অনুনয়েও তিনি কখনও লোকালয়ে বা রাজধানীতে এসে থাকতে রাজি হন নি। সমস্ত রকম ভোগ-সুখেই ছিল তাঁর বিতৃষ্ণা, কোন রকম সঞ্চয়ই তিনি পছন্দ করতেন না। প্রতিদিন ভিক্ষায় যা পেতেন—তা, রাশিকৃত জিনিস পেলেও—সব বিলিয়ে দিতেন, নিজেদের খাওয়ার মতো সামান্য কিছু রেখে।

শিবাজী তখন সামযানগড় দুর্গ তৈরি করাচ্ছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। সে-সময়টা ওদিকে একটু অন্নকষ্ট-মতো হয়েছিল, কতকটা তাদের কাজ দেবার জন্যই শিবাজী ঐ দুর্গ তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন।

রামদাস যখন এলেন, তখন গোটা দুর্গেরই ভিত-গাড়া হয়ে গেছে, বহুলোক লেগেছে কাজে, একসঙ্গে চারদিকে প্রাচীর উঠেছে। এই সময় গুরুদেব আসতে শিবাজী নিজেকে কৃতার্থবোধ করলেন। তিনি ওঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকের কাজ দেখাতে লাগলেন।

ঘুরে দেখাতে দেখাতে এ দুর্গ তৈরির মূল কারণটাও খুলে বললেন শিবাজী। আর তারই মধ্যে, ঈষৎ একটু গর্বের সঙ্গেই

বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে এই কাজে আমি এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি কর্মক্ষম ব্যক্তিকেই লাগাতে পেরেছি। কেউ বেকার বা নিরন্ন আছে এখানে—তা আর বলবার জো নেই।'

'ও, তাই নাকি ? বেশ বেশ। ভারি খুশি হলুম।' রামদাস বললেন, 'খুব ভাল করেছ। এই তো তোমার উপযুক্ত কাজ।'

তারপর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বড় পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার লোকজনকে দিয়ে এই পাথরটা একটু ভাঙাও তো আজ !'

ওঁর এই বিচিত্র খেয়ালের কোন মানেই বুঝতে পারলেন না শিবাজী, কিন্তু গুরু হুকুম করছেন, এই যথেষ্ট, অত মানে বোঝার



প্রয়োজন কি ? তখনই রাজার চোখের ইঙ্গিতে পাঁচ-সাতজন জোয়ান মজুর বড় বড় পাথর-ভাঙা হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে এল, আর দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অত বড় পাথরটা দু'তিন খণ্ডে ভেঙে ফেলল।

পাথরটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল সকলের। অত বড় কয়েক মণ ওজনের নিরেট ভারি পাথরের মধ্যে অনেকখানি ফাঁপা জায়গা আর সেখানে একটা বেশ বড়-সড় জ্যান্ত ব্যাঙ বাস করছিল। জল ছাড়া ব্যাঙ থাকা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয় কোন এক অদৃশ্য জাদুকর সেই গর্তে বেশ খানিকটা জলও রেখে দিয়েছেন। পাথরটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়তেই ব্যাঙটা সেই জল থেকে লাফিয়ে পড়ে লাফাতে লাফাতে বনের দিকে চলে গেল।

কী আশ্চর্য ! এ কি তারা সত্যিই চোখে দেখছে, না কোন জাদুকরের ভেল্‌কি ?

শিবাজীও গুরুদেবের এই দিব্যদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ, অভিভূত। তিনি হাত জোড় করে বললেন 'কিন্তু কী আশ্চর্য গুরুদেব, ঐ নিরস আর নিরেট পাথরের মধ্যে জল কোথা থেকে এল ? অমন স্বচ্ছ, পরিষ্কার জল।'

গুরুদেব বেশ সহজ প্রসন্ন মুখেই জবাব দিলেন, 'এ তোমারই কাজ নিশ্চয় বৎস—নইলে, এত বিবেচনা আর কার হবে !'

তখনও ওঁর কথাটার আসল অর্থ বুঝতে পারেন নি শিবাজী, তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না-না—এ কী বলছেন, এ কি আর আমার দ্বারা সম্ভব—এ তো রীতিমতো অলৌকিক ব্যাপার !'

গুরুদেব আগের মতোই প্রসন্নমুখে উত্তর দিলেন, 'এ তুমি মিথ্যে বিনয় করছ রাজা, ওর মধ্যে ঐ প্রাণীটা আছে জেনেই, পাছে সে উপবাসী থাকে বা জলাভাবে শুকিয়ে মারা যায়—তুমি অনেক ভেবে ঐখানে জলের আর হাওয়ার ব্যবস্থা করেছ ; এ তো আমি বেশ বুঝতে পারছি। তুমি ছাড়া এতটা বিবেচনা কার পক্ষে সম্ভব বলো। আর তোমার রাজ্যে কোন প্রাণীরই তো না খেয়ে থাকার জো নেই। বিচক্ষণ প্রজাপালক তুমি, এটুকু না করলে তোমার মর্যাদা থাকে কই ?

এতক্ষণে কথাটা বুঝলেন শিবাজী। তাঁর অহঙ্কারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন গুরুদেব। জগদ্বাসীকে বাঁচাবার দায়িত্ব জগৎপিতার —তাকে অন্ন যোগানোর চিন্তা অন্নপূর্ণার। মানুষের কী সাধ্য, আর কতটুকু সাধ্য ! সেই শিক্ষাটুকুই দিয়ে তাঁর দর্পচূর্ণ করলেন সন্ন্যাসী রামদাস।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শিবাজীর গুরুর নাম কি ছিল ? তাঁর সম্বন্ধে এই গল্পে যাহা জানিয়াছ লিখ।

২। শিবাজীর কোন্ কথায় গর্বের সুর ছিল? রামদাস শিবাজীর গর্ব কিরূপে চূর্ণ করিয়াছিলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'এক অদৃশ্য জাদুকর সেই গর্তে বেশ খানিকটা জলও রেখে দিয়েছিলেন' —অদৃশ্য জাদুকর কেন বলা হল?

২। 'এ তো রীতিমত অলৌকিক ব্যাপার'—কাহার উক্তি? 'অলৌকিক ব্যাপার' বলিতে কি বুঝায়? আমরা কখন 'অলৌকিক ব্যাপার' কথাটি ব্যবহার করি? এই গল্পে কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক ব্যাপার বলা হইয়াছে?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'তাঁর অহঙ্কারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন গুরুদেব'—কার অহঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে? বাক্যটির তাৎপর্য লিপিবদ্ধ কর।

২। "জগদ্বাসীকে বাঁচাবার দায়িত্ব জগৎ পিতার—তাকে অন্ন যোগানোর চিন্তা অন্নপূর্ণার"—বাক্যটির ব্যাখ্যা লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

যথেষ্ট, লোকালয়, জলাভাব, জগদ্বাসী, সন্ন্যাসী।

২। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ

জ্ঞান, সৎ, পছন্দ, উপযুক্ত, অলৌকিক, বিনয়।

৩। শব্দার্থ লিখ ঃ সৎ-পরামর্শ, অনুনয়, লোকালয়, কৃতার্থবোধ, কর্মক্ষম, ভেল্কি, দিব্যদৃষ্টি, স্বচ্ছ, অলৌকিক, বিচক্ষণ, দর্পচূর্ণ।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) শিবাজী কে ছিলেন?

(খ) রামদাসের সহিত শিবাজীর কি সম্পর্ক ছিল?

(গ) শিবাজী দুর্গ তৈয়ারির কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন কেন?

(ঘ) রামদাস কেন "এই তো তোমার উপযুক্ত কাজ" বলিয়াছিলেন?

(ঙ) পাথর ভাঙিবার পর কি দেখা গেল?

২। (ক) রামদাস কার দর্পচূর্ণ করিলেন?

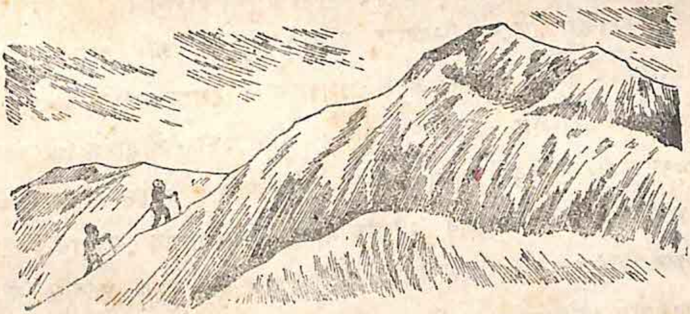
(খ) অন্নপূর্ণা কে?

প্রথম এভারেস্ট অভিযান

—সুমথনাথ ঘোষ

[নগরাজ হিমালয় বহুকাল হইতে পৃথিবীর মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে। এভারেস্ট বিজয় করিতে গিয়া কত মানুষ মৃত্যু বরণ করিয়াছে, কত বিপদের ঝুঁকি লইয়াছে। প্রথমে যাঁরা এভারেস্ট বিজয় করিলেন তাঁহাদের নাম সকলের মুখেমুখে। কিন্তু যে সাহসী অভিযাত্রী প্রথম হিমালয় অভিযান করেন, তাঁর নাম আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু এই প্রথম অভিযাত্রীর কৃতিত্বও কম নয়। তাঁর কাহিনী এখানে বলা হইয়াছে।]

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট অভিযানের চিন্তা মানুষের মাথায় যায়। কিন্তু সত্যিকারের প্রথম অভিযান শুরু হয় ১৯২১ সালে। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে সেই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল পথে যাবার জন্য যিনি সেদিন জীবনপণ করেছিলেন, সেই নির্ভীক পুরুষটির নাম ম্যালোরী।



অবশ্য সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এই দুর্জয় এভারেস্টে ওঠার গৌরব তিনি পান নি। আজ তেনজিং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারীর নাম প্রথম এভারেস্ট-বিজয়ী ব'লে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হলেও, একথা ধ্রুবসত্য যে, ম্যালোরীর নাম এভারেস্ট-বিজয়ী ব'লে লেখা না থাকলেও সেই দুর্গম, দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথের আদি অভিযাত্রী ব'লে সেই ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত থাকবে।

ম্যালোরী কেম্ব্রিজে পড়াশোনা করতেন। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। অতি সুদর্শন এবং মিষ্টভাষী মানুষটি। অনাবশ্যক কথা বলেন না। তাঁর সারা চোখেমুখে একটা দৃঢ়তার ছবি। ১৯২১ সালে তিনি যখন প্রথম এই অভিযানে যোগ দিলেন তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। অভিযানের কথা উঠতেই, তিনি প্রথমে গিয়ে দলে নাম লেখালেন! বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে ঐ এক স্বপ্ন ছিল, পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে উঠবেন। কল্পনায় তিনি সেই ভ্রমণের আনন্দ সকল সময় উপভোগ করতেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে ম্যালোরীর এই অভিযান শুরু হলো। বন্ধু বুলক ও দলবলকে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। নানারকমের গরম কাপড়, জামা, বর্ষাতি, বরফের ওপর দিয়ে চলার কাঁটা লাগানো জুতো, টিনবন্দী খাবার, রাঁধবার সরঞ্জাম, ঘুমোবার ব্যাগ, তাঁবু প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক জিনিসপত্র যতদূর নেওয়া সম্ভব কুলির পিঠে বোঝাই ক'রে দার্জিলিং থেকে তাঁরা রওনা হলেন।

সিকিম থেকে তিব্বতে যাবার যে পথ তাই ধরে ধীরে ধীরে ম্যালোরীর দল অগ্রসর হতে লাগলেন। শেষে চলতে চলতে তাঁরা চুম্বী উপত্যকায় এসে পড়লেন। সিকিমের সীমান্তে এই স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম, নানা জাতীয় ফুল-ফলের গাছে শ্যামল ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে। গাছের মাথায় মাথায় যেন রঙের জোয়ার লেগেছে। কত বিচিত্র বর্ণের, কত বিচিত্র রূপের ফুল-ফল বৃক্ষে, লতায়, কাননে, প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে। কাশ্মীরের মত সেই স্থানটিও অপূর্ব সুন্দর —পাখির কলকূজনে মুখর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুশোভিত।

সিকিম ছেড়ে তাঁরা একেবারে এসে পড়লেন তিব্বত সীমান্তে। সেখানকার প্রথম শহর হ'লো ফারী। শহরটা যেমন নোংরা, তেমনি কুৎসিত! ম্যালোরীর মোটে ভাল লাগল না।

ফারী থেকে ম্যালোরী চললেন টাঙ্গা-লা পর্বত অতিক্রম করে টুনায়। টুনা হ'লো সেই পথটির নাম, যেটি চলে গেছে পাহাড়ের

মধ্য দিয়ে সোজা একেবারে তিব্বতে। অতি সুন্দর এই রাস্তা—উঁচু নিচু অর্থাৎ চড়াই-উতরাই খুব বেশি নেই। এই পথ দিয়েই তিব্বত অভিযানকারীরা একদিন তার রাজধানী লাসায় গিয়েছিলেন।

ম্যালোরী যখন খাম্বাজং পৌঁছলেন তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এভারেস্ট! সেখান থেকে তার দূরত্ব একশো মাইল; শুধু এভারেস্ট নয়, তার সঙ্গে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ও মাকালু—পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের আর দুটি সুউচ্চ শৃঙ্গের একত্র সমাবেশ! এ দৃশ্য জগতে বিরল। বিরল কেন, আর কোথাও নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এরপর যে পর্বতচূড়ায় তাঁরা এসে পৌঁছলেন তার নাম শেখরজং। ইতিপূর্বে আর কোন বিদেশী অভিযানকারীর পদচিহ্ন পড়েনি সেখানে। সেখানে একটি মঠ আছে, তাতে চারশো সন্ন্যাসী থাকেন। আর পাহাড়ের নিচে একটা ছোট শহর গড়ে উঠেছে অল্প কয়েক ঘর লোক নিয়ে। এই মঠের মধ্যে আছে অসংখ্য বহু বড় বুদ্ধমূর্তি, তাদের অধিকাংশ প্রায় দশ ফুট করে উঁচু ও সোনালী রঙ করা। ধূপধূনা অগুরু কস্তুরীর গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ যেন ভারি হয়ে থাকে। প্রকাণ্ড একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে সেখানে দিনরাত।

২৬শে জুন তাঁরা রং বুক উপত্যকায় এসে পড়লেন। আর মাত্র ষোল মাইল গেলেই এভারেস্ট! এবার শুরু হ'লো শুধু বরফের রাজত্ব! তলায় বরফ, পাশে বরফ, সামনে বরফ, যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু যেন সাদা তুষারের সমুদ্র। উঁচু উঁচু পাহাড়, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ ও কঠিন মূর্তিতে, তাদের সর্বাঙ্গে বরফের আবরণ!

উনিশ দিন ধরে ক্রমাগত চলার পর ম্যালোরী এমন এক জায়গায় এসে পড়লেন যেখান থেকে আর এগোনো যায় না। পথ নেই—তিনি চারদিকে তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন, কিন্তু পথ আর কোথাও খুঁজে পেলেন না। আর একটি পথ যা ছিল সে পথে

যেতে গেলেও প্রায় ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে বেশি ঘুরে যেতে হয়। তাই সে চেষ্টা না ক'রে তিনি আবার ফিরে এলেন তাঁর দলে।

২২শে সেপ্টেম্বর ভোর থেকেই ম্যালোরী তাঁর দল নিয়ে রওনা হলেন এবং বেলা সাড়ে দশটার সময় হাক্‌পা লায়ের শৃঙ্গে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে এভারেস্ট মাত্র ছ'মাইলের দূরত্ব।

কিন্তু পরদিন ভোর থেকেই এমন ঝড় শুরু হলো যে, কার সাধ্য এগোয়। তুষার বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝড়ের সঙ্গে মিশে এমন প্রবল বেগে তাদের মুখে চোখে এসে লাগতে লাগল যে, তাঁদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল—হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতেই যেন সব দম ফুরিয়ে যায়। কি সর্বনেশে হাওয়া। আর তাদের অগ্রসর হওয়া হলো না। খাদ্যাভাব নয়, শারীরিক অসুস্থতা নয়, জিনিসপত্রের অভাবেও নয়—শুধু তীব্র পাহাড়ী বাতাসের জন্য সেবার ম্যালোরীর দল এভারেস্টে উঠতে পারলেন না। সেবারের মত সেখানেই যাত্রা শেষ করে তাঁরা ফিরে এলেন। ব্যর্থ হলেও এভারেস্টের বুকে মানুষের সেই প্রথম অভিযান।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। এভারেস্টের সর্বপ্রথম অভিযানকারীর নাম কি? কবে তিনি অভিযান শুরু করেন? তাঁর চেহারা ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

২। ম্যালোরীর এভারেস্ট অভিযান কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ

কেম্ব্রিজ, সিকিম, তিব্বত, কাঞ্চনজঙ্ঘা, তেনজিং নোরগে, এডমণ্ড হিলারী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'গাছের মাথায় মাথায় যেন রঙের জোয়ার লেগেছে'—কোন্ স্থানের এরূপ সৌন্দর্য? 'রঙের জোয়ার' বলিতে কি বুঝি? বাক্যটির অর্থ বুঝাইয়া দাও।

২। ম্যালোরীর অভিযান কাহিনীটি সংক্ষেপে লিখ।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। "কল্পনায় তিনি ভ্রমণের আনন্দ সকল সময় উপভোগ করতেন।"—বাক্যটির ব্যাখ্যা লিখ।

২। "ব্যর্থ হলেও এভারেস্টের বুকে মানুষের সেই প্রথম অভিযান।"—বাক্যটির ব্যাখ্যা লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। বিশেষণ পদগুলি বাহির করিয়া লিখ ঃ
সিকিমের সীমান্তে এই স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম, নানা জাতীয় ফুল-ফলের গাছে শ্যামল ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে।

২। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ দুর্গম, উচ্চতম, কুৎসিত, চড়াই, অগ্রসর।

৩। শব্দার্থ লিখ ঃ
বিপদসঙ্কুল, দুর্জয়, দুর্লঙ্ঘ্য, সুদর্শন, অত্যুক্তি, পদচিহ্ন, অগুরু-কস্তুরী, অভ্যন্তরভাগ, তন্নতন্ন, সর্বনেশে।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) এভারেস্ট কি জন্য বিখ্যাত এবং কোথায় অবস্থিত ?
(খ) ম্যালোরী কে ছিলেন ? তিনি কোন দেশের লোক ছিলেন ?
(গ) শেখরজং কি ? তাহার বর্ণনা দাও।
(ঘ) ম্যালোরী কোন পথ ধরিয়া এভারেস্ট অভিযান আরম্ভ করেন ?
(ঙ) অভিযানের তারিখ কি ছিল ?

২। (ক) চুম্বী উপত্যকার বর্ণনা দাও।
(খ) 'টুনা' কি ?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

—নির্মলেন্দু দাস

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তার ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ দেখা দেয়। মোগল আমলের শেষভাগে ভারতের জাতীয় জীবনের কোনরূপ অগ্রগতি ছিল না। সামাজিক কুসংস্কার, হতাশা ও অর্থনৈতিক দৈন্য তৎকালীন ভারতবাসী তথা বাঙালী জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আচ্ছন্ন জীবনযাত্রা হতে জেগে ওঠাকেই নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলা হয়। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির ফলে বাঙালীর মনে তথা ভারত-বাসীর মনে এই নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য বাংলা দেশেই এই নবজাগরণের সাড়া সর্বপ্রথম দেখা যায়।

দেশ তখন পরাধীন নবজাগরণের এই ঢেউ মানুষের মনে স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগিয়ে তুললো এবং ইংরেজ সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা ও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য দেশবাসী ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। বাঙালীরাই প্রথম এই ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে সহরে সর্বত্রই মানুষ সচেতন হয়ে উঠলেন। তার আগে সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দেশবাসী বহু আগেই দীক্ষিত হয়েছিলেন। জাতীয় জীবনে এই প্রেরণা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে জনসাধারণকে অসাধারণভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুললো। ইংরেজ সরকার এতে বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলো। তারা লক্ষ্য করলো সিপাহী বিদ্রোহ হতে আরম্ভ করে সব কিছু আন্দোলন সর্বপ্রথম মাথা তুলে দাঁড়ায় এই বাংলার মাটিতে।

বাঙালীর এই তীব্র জাতীয়তাবোধকে রোধ করার জন্য ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জন বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিলেন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য মুসলমান অধ্যুষিত বাংলার নামকরণ হলো পূর্ব বাংলা। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটি আন্দোলন জেগে উঠলো। একেই বলা হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ নানা সভা সমিতির মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে আরম্ভ করলেন। এর প্রতিবাদে সেদিন ঘরে ঘরে চললো অরন্ধন। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করলেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল।' তাই দল বেঁধে মানুষেরা গাইতে গাইতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথমে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র। বাঙালীরা এতে সন্তুষ্ট থাকলেন না। তারা ব্রিটিশের স্বার্থে আঘাত দিতে চাইলেন। বিলাতী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার জন্য সকলকে আহ্বান জানালেন। বিদেশীদের স্কুল কলেজ বর্জন করে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করা হলো। এর জন্যে 'জাতীয় শিক্ষা পর্যদ' গঠিত হলো। এই পর্যদের অধীনে কোলকাতায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ স্থাপিত হলো। এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ঋষি অরবিন্দ। দেশবাসী দ্বারা পরিচালিত এবং দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে তেমনি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দেওয়া ছিল জাতীয় শিক্ষা পর্যদের উদ্দেশ্য। দেশব্যাপী এই আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত।

এইভাবে দেশে জাতীয়তাবোধ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করলো। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস তাঁদের গান ও সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতা জাগিয়ে তুললেন। চিত্তরঞ্জন ও বিপিন পালের বক্তৃতায় বাঙালীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত

হলো। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পিকেটিং করে বিলাতী জিনিস বিক্রয় বন্ধ করে দিল। অবশেষে, ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের প্রথমে ইচ্ছা ছিল ইংরেজের কাছ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা। কিন্তু পর পর তাঁরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের এক শ্রেণীর তরুণ দলের কোন আস্থা ছিল না। তাঁরা ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বদেশে বিদেশে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব চালান। এঁদের অগ্নিযুগের বিপ্লবী বলা হয়। এঁদের মধ্যে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবন দান করেন। বিপ্লবী সূর্যসেন, কানাইলাল, বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘা যতীন, ভকত সিং, উল্লাসকর, পিংলে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সরকার এই তরুণ বীরদের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পেয়ে সত্যসত্যই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক একই সময় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জন, গোখলে, লাজপৎ রায়, মতিলাল, বল্লভভাই প্রভৃতি নেতারা জাতীয় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এমনি সময় মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ফিরে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ নীতি গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশের সর্বস্তরের মানুষ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যেন এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রুদ্র জলকল্লোল। আসমুদ্র হিমাচল এই বিপ্লব তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হলো অসহযোগ আন্দোলন; ১৯৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দে লবণ আইনের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সবশেষে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। কত শহীদের পবিত্র রক্ত যে এই সব আন্দোলনের পেছনে আছে আজ আর তার

হিসেব নেই। মেদিনীপুরের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় পতাকা হস্তে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতেই ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত তরুণ তাদের জীবন দেশমাতৃকার পায়ে অঞ্জলি দিলো। তবুও আন্দোলন



থামলো না। কতজন ইংরেজের জেলে বন্দী হলেন, দেশের মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল ইংরেজ সরকার। বাধাবন্ধহারা নদীর উদ্দাম স্রোতের মত আন্দোলনের গতিবেগ প্রবাহিত হতে লাগলো। উদ্দেশ্য দেশমাতৃকার স্বাধীনতা।

এদিকে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে। ইংরেজ ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপে জার্মানী এবং এশিয়াতে জাপানের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল ইংরেজ। এই সময় বাংলার সন্তান সুভাষচন্দ্র এক সম্পূর্ণ নূতন পথে দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশের কড়া পাহারা হতে কৌশলে সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করলেন। তিনি জার্মানী ও জাপানের সাহায্যে ভারতের বাইরে সেনাবাহিনী গঠন করলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন রাসবিহারী বসু। তাঁর এই সেনাবাহিনীর নাম হলো 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ' নিয়ে তিনি পরাধীন ভারত আক্রমণ করলেন। এই বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে আসাম এসে পৌঁছায়। কিন্তু নানা কারণে সুভাষের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। যেভাবে তাঁর বাহিনীতে

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে ইংরেজ সত্য সত্যই ভীত হয়ে পড়ল। তারা ভাবল আর বেশি দিন ভারতে রাজত্ব করা চলবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বল ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তীব্র আন্দোলন আর বেশি দিন সহ্য করতে পারল না। গান্ধীজী দেশ বিভাগে রাজী ছিলেন না; কিন্তু দেশের অন্যান্য কংগ্রেসী নেতা স্বাধীনতা পেতে আরো বিলম্ব হবে বলে দেশ ভাগে রাজী হয়ে গেলেন। ফলে, দেশ ভাগ হলো। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার নাম হলো ভারত বা হিন্দুস্থান এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার নাম হলো পাকিস্তান।

অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ দুই দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশ ছাড়লো। ভারতের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন হলো ঠিকই তবে সেই সঙ্গে ইংরাজের ভেদনীতির ফলে তা দ্বিখণ্ডিত হলো।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। নবজাগরণ কি? নবজাগরণের ফলে আমাদের কি লাভ হইল?

২। কার্জন কত সালে বাংলাদেশকে ভাগ করিয়াছিলেন? ভাগ করার কারণ কি? আবার বঙ্গভঙ্গ রদ হইল কেন?

৩। স্বদেশী আন্দোলন কি? ইহার স্বরূপ কি ছিল?

৪। দেশ স্বাধীন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষ বসুর ভূমিকা কি ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ কি? ইহার কাজ কি ছিল?

২। কি ভাবে দেশ বিভাগ হইল?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। "বাধাবন্ধহারা নদীর…স্বাধীনতা।"—বাক্যটির ব্যাখ্যা লিখ।

২। "ভারতের পরাধীনতার…দ্বিখণ্ডিত হলো।"—বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। সমাস নির্ণয় কর ঃ
নাগপাশ, আম্রকানন, সর্বভারতীয়।

২। অর্থ লিখ ঃ
দুর্বল, ভেদনীতি, অধ্যুষিত, বিভেদ, স্বাদেশিকতা।

মৌখিক ঃ

১। (ক) স্বাধীনতার আগে দেশ ভাগ হইল কেন?
(খ) ঋষি অরবিন্দ কোন্ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?
(গ) 'বন্দেমাতরম্' কথার অর্থ কি?
(ঘ) 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' কি?
(ঙ) 'মাতঙ্গিনী হাজরা' কে ছিলেন?

২। (ক) 'শহীদ' কথার অর্থ কি?
(খ) 'বাংলার মাটি বাংলার জল'—কাহার রচনা?
(গ) 'স্বাদেশিকতা' কথার অর্থ কি?

হনুমানের সীতা অন্বেষণ

—কৃত্তিবাস ওঝা

[বাংলার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস ওঝা প্রথম বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। সীতাকে লঙ্কার রাজা রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যান। বর্তমান অংশে হনুমানের সীতা অন্বেষণের কথা বলা হইয়াছে।]

কাঁদিতে কাঁদিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানাবর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন ॥
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন।
এখানে যদ্যপি পাই সীতার দরশন ॥
মুছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির।
প্রবেশিলা অশোক-কাননে মহাবীর ॥
শিংশপার বৃক্ষে বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর ॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা।
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা ॥
চেড়ী সবে দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর ॥
কেহ কালী, কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী।
খর্জ্জুর গাছের মত দেখি কেশাবলী ॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী ॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা ॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবন নন্দন ॥

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ

১। হনুমান সীতাকে অন্বেষণ করিতে কোন্ বনে প্রবেশ করিল ? সেখানের সৌন্দর্য কবির অনুসরণে বর্ণনা কর।

২। হনুমান সীতার সন্ধান পাইয়াছিলেন কি ? সীতার অবস্থা তখন কিরূপ ছিল ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'পর্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর'—কাহাদের হাতে লোহার মুদগর ? 'পর্বত প্রমাণ' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে ?

২। 'দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা'. কাহাকে দ্বিতীয়ার চন্দ্র বলা হইয়াছে ? 'হীনকলা' মানে কি ? দ্বিতীয়ার চন্দ্র বলিবার কারণ কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। গায়ে মলা......হীনকলা।

২। শ্রীরাম বলিয়া সীতা......পবন নন্দন ॥

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
লাফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর।

২। শব্দার্থ লিখ ঃ নিরীক্ষণ, পিকগণ, কুহরে, অলিগণ, যদ্যপি, চেড়ী, মুদগর, খর্জুর, খাণ্ডা, হীনকলা।

৩। গদ্যরূপ লিখ ঃ কুহরে, উঠিলেক, চিন্তে, হেথা, তথা, যুড়ি।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবিতার রচয়িতার নাম কি ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত ?
(গ) অশোক কানন সম্বন্ধে যাহা জান বল।
(ঘ) 'চেড়ী' কথার অর্থ কি ?
(ঙ) 'জানকী' কাহার নাম ? এইরূপ নামকরণ করিবার কারণ কি ?

২। (ক) 'পবন নন্দন' কাহাকে বলা হইয়াছে ?
(খ) বাংলা দুইটি বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম বল।

গৌরীর আক্ষেপ

—ভারতচন্দ্র

[ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'রায় গুণাকর'। 'গৌরীর আক্ষেপ' অংশটি তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে গৌরীর আক্ষেপের মধ্য দিয়া বাঙালী বধূর জীবনের আক্ষেপ ও হাহাকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

কেবা এমন ঘরে থাকিবে।
এমন দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥
আপনি মাখেন ছাই   আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি   অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥
বিষপানে নাহি লয়   কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ-হিয়া   ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া
ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে ॥

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। গৌরীর আক্ষেপ করিবার কারণ কি ?

২। গৌরীর আক্ষেপের মধ্য দিয়া তাঁহার সংসারের যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লিখ। এই সংসার চিত্রের সহিত দরিদ্র বাঙালী পরিবারের সংসার চিত্রের কোন মিল আছে কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে'—কোন্ দুঃখ বা কাহার দুঃখ? তাঁহার ঘর ছাড়িবার কারণ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। (ক) দামাল ছাবাল……কেবা রাখিবে।

(খ) মা বাপ……ছাড়িবে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। অর্থ বল ঃ

বালাই, দামাল, ছাবাল, দ্বন্দ্ব, বিয়া, কৈতে, পাষাণ-হিয়া।

২। বাক্য রচনা কর ঃ

ছাই, লুটি, বিষপানে, দ্বন্দ্ব, দামাল, দুঃখ।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) ভারতচন্দ্রের উপাধি কি ছিল?

(খ) কবিতাটি তাঁহার কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(গ) তিনি কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?

(ঘ) গৌরী কে?

২। (ক) কে ছাই মাখিয়া থাকেন?

(খ) 'ছাবাল' কথার অর্থ কি?



কপোতাক্ষ নদ

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[দত্তকবি জন্মিয়াছিলেন কপোতাক্ষ নদী তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে। তাই কপোতাক্ষ নদীর স্মৃতি সারাজীবন কবির কাছে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। কপোতাক্ষ নদীর উদ্দেশ্যে কবির প্রাণের ভাষা এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিতাটিকে সনেট বলা হয়। মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন।]

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।—
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী-তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কপোতাক্ষ নদীর উদ্দেশ্যে কবি কি নিবেদন করিতেছেন তাহা নিজ ভাষায় লিখ।

২। কবিতাটির সংক্ষিপ্ত সার লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে'
এখানে 'প্রজা' কে? 'রাজা'ই বা কে? এই কথার প্রকৃত অর্থ কি?

২। 'সখে, সখা-রীতে নাম তার' সখা কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে? কাহার নামের কথা এখানে বলা হইয়াছে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

ব্যাখ্যা কর ঃ

১। (ক) "দুগ্ধ-স্রোতরূপী-তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।"

(খ) "যত দিন যাবে……সংগীতে।"

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। কোনটি কোন পদ লিখ ঃ
কলকল, নদ, মোর, লইছে, তব, কিন্তু, মায়া।

২। শব্দার্থ লিখ ঃ
সতত, বিরলে, মায়া-মন্ত্র, ছলনে, দুগ্ধ-স্রোতরূপী, বঙ্গজ॥

৩। গদ্যরূপ লিখ ঃ
কলকলে, ছলনে, তব, রীতে, সতত, স্বপনে, বঙ্গজ, মজি, লইছে।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি কোন শ্রেণীর কবিতা?

(খ) 'কপোতাক্ষ' নদ কোথায় অবস্থিত?

(গ) কবি এই কবিতাটি কোন দেশে থাকাকালীন লিখিয়াছিলেন?

(ঘ) 'বারিরূপ কর'—কাহাকে বলে?

(ঙ) 'ভ্রান্তির ছলনে'—কথার অর্থ কি?

২। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(খ) 'বঙ্গজ' কথার অর্থ কি?

শ্রাবণে

—অক্ষয়কুমার বড়াল

[শ্রাবণে প্রকৃতির দৃশ্য বড়াল কবির চোখে কি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে জানালার পাশে সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া,
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি,
পাখিগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই পথে লোকজন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হতে লাফায় ফড়িং কভু
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি নীড় উঠিছে আকাশে।
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে শ্যাম ঘাসে।
মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছে জল টল্‌মল্‌ থল্‌ থল্‌
বুকে বায়ু থরথর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে আছে অন্ধকার
কোথা যেন হতেছে প্রলয়।

কুটিরে বসিয়া গৃহী   পুত্র-পরিবার-সহ
কত দুর্যোগের কথা কয়।
চেয়ে আছি শূন্যপানে,   কোনো কাজ হাতে নাই—
কোনো কাজে নাই বসে মন !
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ;   দেহ আছে, মন নাই।
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি ;   কেন উঠি, কেন বসি।
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান !   কি সুর—কি ভাব তার
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। এই কবিতায় কবি শ্রাবণের মাঠের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা নিজ ভাষায় লিখ।

২। 'তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই, দেহ আছে মন নাই' কবির এই অবস্থা হইবার কারণ কি ? এ কিরূপ অবস্থা তাহা বুঝাইয়া লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'ধরা যেন অস্ফুট স্বপন'—'অস্ফুট স্বপন' মানে কি ? ধরাকে অস্ফুট স্বপন বলা হইয়াছে কেন ?

২। 'জীবনের আজি অবকাশ'—কবি এই কথা বলিয়াছেন কেন ? 'অবকাশ' কথার অর্থ কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) চেয়ে আছি শূন্যপানে⋯অস্ফুট স্বপন।

(খ) এই উঠি, এই বসি⋯আজ মনে নাই।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। (ক) শব্দগুলি হইতে বিভক্তিগুলি বাহির কর ঃ
জানালার, জলায়, মাঠের, বাতাসে।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ
বাস, দল, মাথা।

(গ) শব্দার্থ লিখ ঃ
অবকাশ, ভেকদল, নবশ্যাম, প্রলয়, দুর্যোগ, অস্ফুট, গৃহী।

(ঘ) গদ্যরূপ লিখ ঃ
রহিয়াছে, খসিয়া, ডাকিয়া, জাগাইয়া, হতেছে।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

(ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর ঃ

আবৃত্তির সুবিধার জন্য ঃ

সারাদিন/একখানি/ জলভরা/কালমেঘ
রহিয়াছে/ঢাকিয়া আ/কাশ।
বসে জানা/লার পাশে/ সারাদিন/আছি চেয়ে
জীবনের/আজি অব/কাশ।

(খ) মেঘ কেমনভাবে আকাশে ছিল ?

(গ) কবি কি করিতে ছিলেন ?

(ঘ) তরু, ফুল, লতা, পাখি, ফড়িং ও ভেকদের কি কি অবস্থার মধ্যে এই কবিতায় দেখা যায় ?

(ঙ) শ্রাবণে মাঠের অবস্থা বর্ণনা কর।

(চ) গৃহী মানুষেরা বর্ষার সময় কি করিতেছিলেন ?

(ছ) কবির অবস্থা বর্ণনা কর।

২। (ক) কবির নাম কি ?

(খ) কবির মধ্যে অস্থিরতা কেন দেখা দিয়াছে ?

(গ) 'কি গান—কাহার গান কি সুর—কি ভাব তার
ছিল কভু আজ মনে নাই'—এই পঙক্তিগুলির অর্থ বল ?

(ঘ) 'ফটিক জল'—কথার অর্থ কি ? কি জন্য কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে ?

(ঙ) কবিতাটিতে কি কি পাখি ও পতঙ্গের কথা আছে ?



মধ্যাহ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিতাটিতে মধ্যাহ্নের একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্ন কবিতাটি 'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।]

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতহীন। অর্ধ-মগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদী কূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্যকরি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গমে স্বচ্ছ পক্ষ ভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্রপক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূরে।

থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য-'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ু ভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তি রাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।
প্রবাস বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে।
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে; ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দ রস করিয়া শোষণ।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি মধ্যাহ্ন কালের যে চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। তুমি যেখানে বাস কর সেখানের মধ্যাহ্নকালীন চিত্রের সহিত কবির বর্ণনার কোন মিল রহিয়াছে কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। "আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে"—আমি কে ? সকল বলিতে কাহারা। কেমন করিয়া তিনি তাহাদের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন ?

২। 'বেলা দ্বিপ্রহর'—দ্বিপ্রহরের প্রাকৃতিক চিত্র লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা কর ঃ (ক) 'প্রবাস বিরহ…মাঝে' ;
(খ) 'ধরণীর বক্ষতলে…শোষণ'।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। সমাস নির্ণয় কর ও ব্যাসবাক্য বল ঃ
দ্বি-প্রহর, রৌদ্রতপ্ত,, শুভ্রপক্ষ, তৃণগন্ধ, অব্যক্ত, স্নিগ্ধচ্ছায়া, পরবাসী, আনন্দরস, সুষুপ্ত।

২। শব্দগুলির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর এবং অর্থ বল ঃ
জর্জর, অর্ধমগ্ন, রৌদ্রতপ্ত, শষ্প, পতঙ্গম, কলভাষ, চঞ্চুপুট, মর্মর, অব্যক্ত, সুষুপ্ত।

৩। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ
আনন্দ, তপ্ত, শুষ্ক, শান্ত, জীর্ণ, শূন্য, করুণ, বিরহ, আদি, নবীন।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি হইতে পরিচিত পাখি, জীবজন্তু, বস্তু ও বৃক্ষ-লতা-গুল্মগুলির নাম বাহির কর।
(খ) নদীটি কিরূপ। (গ) মাছরাঙা কোথায় বসিয়াছিল ? (ঘ) মাঠটি দেখিতে কিরূপ ? (ঙ) দাঁড়কাক কেমন করিয়া স্নান করিতে-ছিল ? (চ) 'শ্যাম শষ্পতটে'—কথার অর্থ কি ? সেখানে কি দেখা যায় ? (ছ) পরবাসী কথার অর্থ কি ? (জ) গ্রামের কুকুরেরা কি করে ? (ঝ) চিলের কি শোনা যাইতেছিল ? (ঞ) পতঙ্গমে কি করিতেছিল ? (ট) মহিষ কি অবস্থায় ছিল ?

২। (ক) কবিতাটি কবির কোন কাব্যের অন্তর্গত ?
(খ) "ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে"—এইরূপ বলিবার কারণ কি ?



হতে পার্তাম

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত। এইটি একটি হাসির কবিতা। আগের দিনে রাজার পারিষদবর্গ যে অন্ধভাবে রাজাকে অনুসরণ করিত, এখানে তাহার পরিচয় পাইবে। রাজার বীর ও কবি হওয়ার পক্ষে যে সব অসুবিধা দেখানো হইয়াছে তাহা বড়ই হাস্যকর ব্যাপার।]

রাজা। দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির ;
আর ওই বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তলোয়ার দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি চটে ম'টেই তো—
তা নইলে খুব এক বড়ো—

পারিষদবর্গ। হাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো...

রাজা। দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই ;
আর. ভাষাটাও, তাছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মার্লেও দেয় নাকো সে সাড়া ;
তাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হয়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই তো—
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ। হাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। রাজা বীর হইতে অথবা রাজা কবি হইতে পারিলেন না কেন ?

২। পারিষদবর্গ কেন বারে বারে রাজাকে সমর্থন করিলেন ? পারিষদবর্গের কাজ কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'খোলা তলোয়ার দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ'—'শিরোহীন এ স্কন্ধ' বলিতে কি বুঝ ? কাহার এই অবস্থা হইয়াছিল ?

২। 'তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম'—'বাক্যে বীর' বলিতে কি বুঝ ? কে এবং কেন বাক্যে বীর হইয়া রহিলেন ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাক্যগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও ঃ

(ক) আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই…শিরোহীন এ স্কন্ধ।

(খ) তাই নীরব কবি হয়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই তো—

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। 'উঁচুদর', 'সঙ্গীন' শব্দ দুইটি ভিন্নার্থক বাক্যে ব্যবহার কর।

২। শব্দার্থ শেখ ঃ

বারুদ, সঙ্গীন, ধন্দ, স্কন্ধ, গরমিল।

৩। বাক্য তৈয়ারি কর ঃ

গোলাগুলি, শিরোহীন, চ'টে ম'টে, গরমিল, নীরব কবি।

৪। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ

স্থির, পছন্দ, খাড়া, উঁচু, বড়ো, মস্ত।

৫। দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ ঃ

স্কন্ধ, সাড়া, গরমিল।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি কবির কোন কাব্যের অন্তর্গত ?

(খ) 'বীর' হইতে গেলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন ?

(গ) 'কবি' হইতে গেলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন ?

(ঘ) 'পারিষদ' কথার অর্থ কি ?

(ঙ) 'সঙ্গীন' কাহাকে বলে ?

(চ) 'গোলাগুলি' কি কাজে লাগে ?

(ছ) 'ধন্দ' কথার অর্থ কি ? 'বাক্যে বীর' বলিতে কি বুঝ ?

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।



নির্ঝরের যাত্রা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'অনুপূর্বা' তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান কবিতাটি 'ত্রিযামা' কাব্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। কবিতাটিতে 'নির্ঝরের যাত্রা'র একটি সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।]

স্তব্ধ পাষাণ-কূটে
এল মেঘ সম্পুটে
সাগরের তরঙ্গ বার্তা ;
তাই এই চঞ্চল
কুলু কুল কলো-কল্
কোন দূর সিন্ধুর যাত্রা।
পাহাড়ের দূত মোরা
সাগরের যাত্রী—
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
চলি দিবা রাত্রি ॥
দু'হাতে পাথর কেটে
চল্ চল্ চলি তাই,
তরুলতা গুল্মেরে,
উল্মলি 'দলি' যাই।
জানি, পথ দুর্গম,
জানি, পথ বন্ধুর,—
দেখি, যদি দেখা পাই
সিন্ধুর।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। 'নির্ঝরের যাত্রা' কবিতার মূল ভাবটি সংক্ষেপে লিখ।

২। কবিতাটিতে কিভাবে নির্ঝর যাত্রা করিয়াছে লিখ। নির্ঝর অবশেষে কোথায় মিলিতে চায়?

৩। কবিতাটির নাম 'নির্ঝরের যাত্রা' দিবার কারণ কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'কোন দূর সিন্ধুর যাত্রা'—কাহার যাত্রার কথা বলা হইয়াছে? 'সিন্ধুর' কথার অর্থ কি?

২। 'জানি পথ দুর্গম জানি পথ বন্ধুর'—কোন্ পথের কথা বলা হইয়াছে?

৩। পথ দুর্গম অথবা বন্ধুর কেন? পাহাড়ের দূত কারা? পাহাড়ের দূতরা কিভাবে পথ করিয়া চলে? ইহাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা লিখ ঃ (ক) জানি, পথ…সিন্ধুর।
(খ) পাহাড়ের দূত…দলি' যাই।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। গদ্যরূপ লিখ ঃ উল্মালি, দলি।

২। অর্থ বল ঃ মেঘ সম্পুট, তরঙ্গ, বার্তা, সিন্ধু, গুল্ম, উল্মালি, বন্ধুর, দুর্গম।

৩। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ
সিন্ধুর যাত্রা, সাগরের তরঙ্গ, দুহাতে পাথর কেটে।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ
উচ্ছ্বাস, উল্লাস, চঞ্চল, দুর্গম।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবির কোন কাব্য হইতে কবিতাটি গৃহীত?
(গ) কবির আরও কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের নাম কর।

২। (ক) তরুলতা গুল্মেরে/উল্মালি 'দলি যাই'—কথাগুলির অর্থ প্রকাশ কর।
(খ) 'মেঘ-সম্পুটে' অর্থ কি?
(গ) নির্ঝরকে 'পাহাড়ের দূত' বলা হইয়াছে কেন?
(ঘ) 'উল্লাসে উচ্ছ্বাসে/চলি দিবা রাত্রি'—বলিবার কারণ কি?

মধু-জীবন

কালিদাস রায়

[কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে, ৯ই জুলাই বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা কাব্যের জগতে তাঁহাকে 'কবিশেখর' বলা হইয়া থাকে। তিনি আমরণ বঙ্গসরস্বতীর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থগুলি হইল ঃ 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজরেণু', 'হৈমন্তী', 'বৈকালী' 'সন্ধ্যামণি' ইত্যাদি। কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি বাংলা সাহিত্যের উপর কয়েকখানি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'মধু জীবন' কবিতাটি তাঁহার 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।]

কুসুমের বনে যে জীবন যাপে প্রজাপতি
এ ধরায় আমি সে জীবনখানি চাই
যে জীবনে নাই কোন ভয় ভীতি ক্ষয়ক্ষতি,
নাহিক বরষা, শীতের পীড়ন নাই।
হিসেবি লোকেরা বলে,—'হয়োনাক প্রজাপতি,
সঞ্চয়ী নয়, দুর্দিনে তারা মরে,
হও মৌমাছি, দেখ তারা নয় মূঢ়মতি,
শীতের জন্য মৌচাক তারা গড়ে।'
ফুলই যখন ফুটিল না হায় ধরণীতে,
শুষ্ক যখন কুঞ্জকানন সবই,
কি লাভ বাঁচিয়া জীবনের সেই ভরা শীতে
মরণই ত ভালো,—চিরদিনই কয় কবি।
ফুল ফুরালেই জীবন ফুরায়ে যায়
সেই প্রজাপতি হতে চাই তাই।
পুষ্প-বিহীন হবে যবে সংসার
চক্রকুহরে বাঁচিতে চাহি না ভাই।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটির সারমর্ম লিখ।

২। কবি প্রজাপতির জীবন চাহিয়াছেন কেন? প্রজাপতির জীবন সম্বন্ধে 'হিসেবি' লোকের ধারণা কি? 'হিসেবি' লোকেরা মৌমাছির জীবন কামনা করিতে চাহেন কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। "মরণই ত ভালো,—চিরদিনই কয় কবি"—কবির এইরূপ বলিবার কারণ কি?

২। প্রজাপতির জীবনের সহিত কবির জীবনের কি কোন মিল রহিয়াছে?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা লিখ ঃ (ক) ফুলই যখন…কয় কবি।
(খ) পুষ্প বিহীন…চাহি না ভাই।
(গ) যে জীবনে নাই…পীড়ন নাই।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। পদ পরিবর্তন কর ঃ ভীতি, শুষ্ক, সংসার।

২। অর্থ বল ঃ যাপে, পীড়ন, মূঢ়মতি, পুষ্প-বিহীন, চক্রকুহরে, দুর্দিন।

৩। গদ্যরূপ লিখ ঃ যাপে, নাহিক, কয়।

৪। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ জীবন, ভয়, পীড়ন, দুর্দিন, লাভ।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবির নাম কি? কবির কোন কাব্যগ্রন্থ হইতে কবিতাটি গৃহীত?
(গ) কবির আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম বল।

২। (ক) কবি কিরূপ জীবন যাপন করিতে চাহিয়াছেন?
(খ) হিসেবি লোকেরা বলে, 'হয়োনাক প্রজাপতি'—এইরূপ বলিবার কারণ কি? 'হিসেবি লোক' বলিতে কাহাদের বুঝান হইয়াছে?
(গ) 'মরণই ত ভালো,'—এই কথা কে বলিয়াছেন?
(ঘ) 'চক্রকুহরে'—কথার অর্থ কি।



দুর্দিনের অতিথি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সে দিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে
কামিনী ফুল ফুট্‌ল বনে ;
আমি তাহার একটি গুচ্ছ
তুলে নিলাম পুলক মনে ।
ঘরে এসেই দোয়াত হ'তে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়াতের সে ফুলদানীতে
ফুলটি রেখে দেখ্‌ছি খালি ;
জোর বাতাসে, হঠাৎ, ঘরে
ঢুকল সে এক প্রজাপতি ;
রইল রে সে সারাটি দিন,
এক্‌লা ঘরের হ'য়ে সাথী ।
অতিথ্‌ হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হ'তেই ;
ঝড় বাদলে, ছাড়্‌তে তা'রে,
পারব না ত' কোন মতেই ।
কবাট দিলাম বন্ধ ক'রে,
জানালা দিয়ে দিলাম তাই ;
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে,
ভাবছি ব'সে কত কথাই ।

হঠাৎ উড়ে, আলোয় প'ড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;
হায়, অতিথি ! নয়ন-জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল ।

দুর্দিনের সেই অতিথিরে,
হায়, সুদিনের সুপ্রভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথেয় দিয়ে,
পেলাম নারে আর পাঠাতে ।

আবার আমি তেমনি ক'রে,
অনল-দগ্ধ দেহটি তা'র,
রেখে দিলাম ফুলের 'পরে ;
এঁকে নিলাম বুকে আমার !

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ অতিথি তাঁহার ঘরে আসিয়াছিল ? অতিথির পরিণতি কি হইল ?

২। কবিতাটির মর্মকথা নিজ ভাষায় লিখ ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'আমার স্নেহ পাথেয় দিয়ে পেলাম নারে আর পাঠাতে,' 'স্নেহ-পাথেয়' বলিতে কি বুঝ ? কাহাকে কেন পাঠাইতে পারিলেন না ?

২। 'এঁকে নিলাম বুকে আমার'—কি বুকে আঁকিয়া লইলেন ? 'বুকে আঁকা' মানে কি ।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

ব্যাখ্যা কর ঃ

ক) হায় অতিথি……ভরে এল ।

খ) দুর্দিনের সেই……আর পাঠাতে ।

গ) আবার আমি……বুকে আমার !

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ পুলক, বন্ধ, সন্ধ্যা, আলোয়, দুদিন।

২। অশুদ্ধ সংশোধন কর ঃ অতিথি, সাথী, সন্ধ্যা, প্রদীপ।

৩। শব্দার্থ লিখ ঃ কবাট, সুপ্রভাত, পাথেয়, অনল-দগ্ধ।

৪। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ নয়ন-জলে, অনল-দগ্ধ, ঘরে এসেই **দোয়াত হতে, কবাট** দিলাম বন্ধ করে, **জানালা** দিয়ে দিলাম তাই, **সন্ধ্যা বেলায়** প্রদীপ জেলে।

৫। সমার্থক দুইটি করিয়া শব্দ লিখ ঃ গুচ্ছ, অনল, নয়ন, দুদিন, অতিথি স্নেহ।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

খ) কবিতাটির রচয়িতা কে ?

২। ক) কি ফুলের 'গুচ্ছ' কবি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন ? কবি তাহা কোথায় রাখিয়াছিলেন ?

খ) কে কবির ঘরে অতিথি হইয়া আসিয়াছিল ? তাহার পরিণতি কি হইল ?

গ) কবি কাহার অনল-দগ্ধ শরীরটি ফুলের উপর রাখিয়াছিলেন ? রাখিবার কারণ কি।

ঘ) 'দুদিনের অতিথি'—বলিবার কারণ কি ?

ঙ) কবি দরজা জানালা বন্ধ করিয়াছিলেন কেন ?



পুত্ররত্ন

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। এখানে এক জহুরীর পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা বলা হইয়াছে। জহুরীর পিতৃভক্তি সমস্ত ধনরত্নের ঊর্ধ্বে এই কথাই কবিতার মূল বক্তব্য।]

বহুদিন আগে—কতদিন আগে ? সে সব প্রশ্ন থাক্,
মহারাজা এক পুত্রের লাগি, করিতেছিলেন যাগ।
শ্রেষ্ঠ পঞ্চরত্ন-খচিত স্বর্ণ-বলয় গড়ি',
পুরশ্চরণ করি' দিতে হবে তুষিতে মহেশ্বরী।

চারিটি রত্ন বসানো হয়েছে মাঝে ঠাঁই আছে ফাঁকা,
বসাতে হইবে হীরক যাহার মূল্য লক্ষ টাকা।
আনিতে হীরক রাজ-অনুচর ঝটিতি হৃষ্টচিতে,
দিবস দুপুর হ'ল উপনীত মণিকার বিপণিতে।

একা মণিকার রয়েছে বসিয়া বড় শুভদিন তার,
একটা যুগেও হয় না সুবিধা এত বড় সওদার।
ব্যাপার জরুরী, পুলকে জহুরী চাবিটি আনিতে ধায়,
দেখিল জনক উপাধান তলে রাখি 'তা' নিদ্রা যায়।

বড় প্রলোভন—রাজ-আমাত্য দ্বিগুণ মূল্য হাঁকে,
পিতাকে উঠাতে সঙ্কোচ করে ফিরাতেও নারে তাকে।
ফাঁপর তনয়, বৃদ্ধ পিতাকে জাগাতে পারে না হায়,
দুটি বিনিদ্র রজনী কেটেছে রোগ যন্ত্রণায়।

কহিল জহুরী, আজ ফিরে যান,—সব লাভ দিয়া বাদ
ক্রয়-মূল্যেই কাল দিব হীরা, ক্ষমিবেন অপরাধ।
পিতার আমার ভাঙ্গাইতে ঘুম কাঁদিয়া উঠিছে বুক,
পুত্রের কাছে সব চেয়ে দামী পিতার শান্তি-সুখ।
অমাত্য কন,—ভাঙ্গাও নিদ্রা, লাভ সামান্য নয় ;
জহুরী বলিল, মিলে না নিদ্রা অর্থে ত মহাশয় !

ফিরি' অমাত্য নৃপতির কাছে নিবেদিল সব কথা।
শুনি ঋত্বিক বলেন, হীরক খুঁজিতে হবে না বৃথা।
কুঙ্কুম আর কস্তুরী গুলে প্রস্তুত কর কালি,
বসাইব হীরা দেখি, বলয়ের কোন্ ঠাঁই আছে খালি ?
সেথা সযত্নে পিতৃভক্ত জহুরীর নাম লিখে,
অভিষেক করি ঋত্বিকবর নিবেদিল জননীকে।
বলিলেন তিনি, এমন হীরক মিলিবে না আর দু'টা,
এমন পুত্ররত্নের কাছে সকল রত্ন ঝুটা।

দেবীর বলয়ে দেখিল সকলে সাঙ্গ হইলে ব্রত,
পিতৃভক্ত জহুরীর নাম জ্বলিছে হীরার মত।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। মহারাজা যজ্ঞ করিতেছিলেন কেন ? যজ্ঞের মানত কি ছিল ?
২। রাজা হীরকের বদলে কি দিয়া পূজা সম্পূর্ণ করিলেন ?
৩। পুত্ররত্ন কবিতাটি গল্পাকারে লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'জহুরী বলিল, মিলে না নিদ্রা অর্থে ত মহাশয়',—জহুরী কাহাকে কেন একথা বলিল ? 'নিদ্রা অর্থে মিলে না' বলিতে কি বুঝ ?

২। 'এমন পুত্ররত্নের কাছে সকল রত্ন ঝুটা'—এই কথা কে বলিতেছেন ? 'এমন পুত্ররত্ন' বলিতে কাহার কথা বলা হইতেছে ? বাক্যটির অর্থ বুঝাইয়া দাও।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) দেবীর বলয়ে দেখিল সকলে…জ্বলিছে হীরার মত।

(খ) পিতার আমার……পিতার শান্তি সুখ।

(গ) অমাত্য কন……অর্থে ত মহাশয়।

(ঘ) বলিলেন তিনি……রত্ন ঝুটা।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লিখ ঃ
পুরশ্চরণ, যাগ, পঞ্চরত্ন, স্বর্ণ-বলয়, মহেশ্বরী, হৃষ্টচিতে, বিপণি, জহুরী, বিনিদ্র, ঋত্বিক, কুঙ্কুম, ঝুটা।

২। বাক্য রচনা কর ঃ
জহুরী, দ্বিগুণ, সঙ্কোচ, শান্তি-সুখ, বৃথা, পিতৃভক্ত।

৩। গদ্যরূপ লিখ ঃ
লাগি, ঠাঁই, ধায়, ক্ষমিবেন, নিবেদিল, গড়ি।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবির নাম বল।

২। (ক) 'জহুরী' কাহাকে বলে ? ইহাদের কাজ কি ?
(খ) 'মণিকার বিপণি' কি ? সেখানে কে, কেন গিয়াছিলেন ?
(গ) 'জহুরী' তার পিতাকে জাগাইতে চাহে নাই কেন ?
(ঘ) 'অমাত্য' কথার অর্থ কি ? তিনি রাজার কাছে কি নিবেদন করিলেন ?
(ঙ) পিতৃভক্ত জহুরীর নাম 'বলয়ের' ফাঁকে লিখা হইল কেন ?
(চ) কবিতাটির নাম 'পুত্ররত্ন' হইল কেন ?

৩। (ক) 'বলয়' কথার অর্থ কি ? বলয় কি কাজে লাগে ?
(খ) 'এমন পুত্ররত্নের কাছে সকল রত্ন ঝুটা'—অর্থ বল।



মাতৃহারা

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[মাতৃহারা একটি ছোট্ট বালিকার অন্তরের বেদনা সুন্দরভাবে এই কবিতায় কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিশুমনের বেদনা, সংশয় এই কবিতার মূল উপজীব্য।]

বাবুদের বাড়ী বোধন বসেছে, কানে আসে ঐ বাজ্‌না তার,
কলকাতা হতে যাত্রা এসেছে—শুনছি সে নাকি চমৎকার !
—মায়ের আবার পুজো কি লো দিদি, মার ভালবাসা সেই তো সব,
এমন ঘটার কি যে দরকার, কেন ধূমধাম মহোৎসব ?
সবাই বলছে—এমন মাকে তো এদেশে কখনো দেখেনি লোক,
ঝলমলে রঙ, সোনার মুকুট, যেমন চেহারা, তেমনি চোখ !
ক'দিন আগে তো গিয়েছি সে-বাড়ী—দেখি ও-পাড়ার জগন্নাথ
খড় দড়ি আর মাটিতে তৈরি করে ঠাকুরের দশটা হাত।
এ কেমন দিদি ? সারা গাঁয়ে শুনি—তাঁকেই সবাই ডাকেন মা,
আমাদের মা তো আমাদেরই মতো, এমন তো তিনি ছিলেন না !
স্বর্গ হইতে মা আসেন নাকি ? দেখেছি সে-কথা সত্যি নয় !
মানুষেরই হাতে গড়া সে ঠাকুর, মা-নাম মিথ্যামিথ্যি কয় !
বছরের পরে মা আসেন ঘরে—বড় লোকদেরই শুনতে পাই,
টাকা আছে যার, মা কি শুধু তার ? গরীবের ঘরে আসতে নাই ?

আমাদের মাও স্বর্গে শুনেছি, কই তিনি ফিরে' আসেন না।
আগেকার মতো চুমো খেয়ে মুখে কেন তবে ভালোবাসেন না ?
খাইয়ে, সাজিয়ে, কাছে ক'রে শুয়ে কত মনে পড়ে আদর তাঁর,
কথাও কয় না, কোলেও লয় না, কোনো সাড়া নাই মাটির মার !
কি হ'ল লো দিদি ? মায়ের কথায় চোখে বুঝি তোর এসেছে জল ?
কি করিব ভাই, সত্যি কথাই মুখে এসে পড়ে, কি বলি বল্ ?
যে যাই বলুক, মুখের কথায়—মিথ্যা সে সব, কিচ্ছু নয় ;
পৃথিবীতে যার নিজের মা নাই, পরের মা তার আপন হয় ?

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। শিশুটির মনে পূজার মহোৎসব দেখিয়া কি প্রশ্ন জাগিয়াছে ?

২। মাটি দিয়া গড়া প্রতিমাকে শিশু 'মা' বলিতে রাজী নয় কেন ?

৩। শিশুটির মনের ভাব কবিতাটিতে কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিজ ভাষায় লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'আমাদের মা তো আমাদেরই মতো এমন তো তিনি ছিলেন না'—এই উক্তি কাহার ? কোন মায়ের কথা বলা হইয়াছে ? এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

২। 'পৃথিবীতে যার নিজের মা নাই, পরের মা তার আপন হয় ?'—পরের মা বলিতে কোন মাকে বুঝান হইয়াছে ? মা আপন হইতেছে না কেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। ব্যাখ্যা কর :

(ক) বছরের পরে মা আসেন ঘরে…গরীবের ঘরে আসতে নাই ?

(খ) যে যাই বলুক…পরের মা তার আপন হয় ?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। (ক) শব্দার্থ লিখ ঃ ঘটা, মহোৎসব।

(খ) লিঙ্গান্তর কর ঃ মায়ের, ঠাকুরের, দিদি, ভাই।

(গ) বিপরীত শব্দ লিখ ঃ গরীব, স্বর্গ, আপন, মিথ্যা।

(ঘ) পদ পরিবর্তন কর ঃ পৃথিবী, স্বর্গ।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(খ) কবির নাম বল।

২। (ক) কবিতাটিতে দিদির কাছে যে প্রশ্ন করিয়াছে, সে কি ছেলে অথবা মেয়ে ?

(খ) ছেলেটি মাটির প্রতিমাকে মা বলিতে চায় না কেন ?

(গ) ছেলেটির মা কোথায় গিয়াছেন ?

(ঘ) 'টাকা আছে যার মা কি শুধু তার ?'—এই কথা বলিবার কারণ কি ?

(ঙ) 'মায়ের কথায় চোখে বুঝি তোর এসেছে জল ?'—চোখে জল আসিবার কারণ কি ?

(চ) 'বোধন' কথার অর্থ কি ?

(ছ) 'দেখি ও পাড়ার জগন্নাথ'—জগন্নাথ কে ? তার কাজ কি ?

(জ) 'সারা গাঁয়ে শুনি—তাঁকেই সবাই ডাকেন মা'—কোন মায়ের কথা বলা হইয়াছে ?

মাতৃ বন্দনা

রজনীকান্ত সেন

[কবি রজনীকান্ত সেন মাতৃবন্দনা কবিতায় মাতৃ হৃদয়ের অপার স্নেহমমতার বর্ণনা করিয়াছেন।]

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে !
মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি,
বদন পানে চেয়ে থাকি রে।

করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মন গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে' আঁখি-জল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ ধূলি সাথে, আশিস রাখি মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি' রে।

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির পীযূষ-নির্ঝর ;
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমো জননি দেবী মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিপিবদ্ধ কর।

২। কবিতাটিতে পরম স্নেহময়ী মায়ের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি'—মায়ের এই মঙ্গলময়ী মূর্তির পরিচয় দাও।

২। মায়ের সেবা পরায়ণ মূর্তির পরিচয় দাও।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) স্নেহ-বিহ্বল…লাগি রে। (খ) চরণ-ধূলি সাথে…জাগি'রে।
(গ) নমো নমো…মাগি রে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। অর্থ বল ঃ

অশরণ, বদন, হৃদি, বিমুখী, নিরাশ্রয়।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ

নিরাশ্রয়, নির্ভর, নির্ঝর।

৩। গদ্যরূপ লিখ ঃ
আসি, মাগি, তুলি, বরষিছে, মাথে, হৃদি, চুম্বে, ধরি।

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ ঃ
স্নেহ-রাশি, নিরাশ্রয় শিশু, করুণাভরা, যাতনা-তাপ, স্নেহ-অঞ্চল।

৫। বিপরীত শব্দ লিখ ঃ
অচলা, নিরাশ্রয়, অসীম, পুণ্য, কৃশ, মলিন, শান্ত।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবির নাম উল্লেখ কর।

২। (ক) 'শিয়রে জাগে কার আঁখিরে'—কার কথা বলা হইয়াছে? শিয়রে তাঁর আঁখি জাগিয়া থাকিবার কারণ কি?
(খ) 'অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে'—কি কারণে তনু কৃশ, অবশ ও মলিন? অনশন করিবার কারণ কি?
(গ) 'অশরণ' কথার অর্থ কি?
(ঘ) 'অচলা মতি পদে মাগিরে'—কার পদ প্রার্থনা করা হইয়াছে?
(ঙ) 'সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে'—কি কারণে সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া ওঠে?

কিশোর

গোলাম মোস্তাফা

[কবিতাটিতে কিশোর মনের আশা আকাঙ্খার কথা বলা হইয়াছে।]

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙ্গা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপ্‌ড়ি পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুট্‌ব মোরা ফুট্‌ব গো,
অরুণ রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুট্‌ব গো!
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দেব সৌরভে
আকাশ পানে তুলব মাথা সকল বাঁধন টুট্‌ব গো।
সাগর জলে পাল তুলে দে' কেউ বা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বসের মতই বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময়
এই বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।
কেউ বা হ'ব সেনানায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল,
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি' নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশমাতারে পূজব গো,
ব্যথীর ব্যথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি ধন্য হবে অন্নজল।

জ্ঞান-গরিমা শিখব ব'লে কেউ বা যাব জার্মানি,
সবার আগে চলব মোরা, আর কি কভু হার মানি ?
শিল্পকলা শিখ্‌ব কেউ,
গ্রন্থমালা লিখ্‌ব কেউ,
কেউ বা হ'ব ব্যবসাজীবী কেউ বা 'টাটা' 'কার্ণানি'।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।
আকাশ-আলোর আমরা সুত,
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কি যে করব মোরা—নাইক তাহার অন্তরে।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ

১। কিশোর মনের কি কি আশা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লিখ।

২। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপ্‌ড়ি পাতার বন্ধনে'
—বুকের ভাষা ঘুমিয়ে আছে অর্থ কি ? 'পাপ্‌ড়ি পাতার বন্ধনে' প্রকৃত অর্থ কি ?

২। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'—বাক্যটির তাৎপর্য লিখ। শিশু এবং পিতা বলিতে কি বুঝ ?

৩। টীকা লিখ ঃ কলম্বস, জার্মানি, টাটা, কার্ণানি।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) সাগর জলে পাল তুলে দে'…নূতন দেশ।

(খ) ভবিষ্যতের লক্ষ আশা…শিশুরই অন্তরে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। মোটা হরফের পদগুলির বচন নির্ণয় কর ঃ

(ক) কেউ বা হ'ব **সেনানায়ক**, গড়ব নূতন **সৈন্যদল**।

(খ) **গ্রন্থমালা** লিখব কেউ।

(গ) ঘুমিয়ে আছে শিশুর **পিতা** সব **শিশুরই** অন্তরে।

২। শব্দার্থ লিখ ঃ ওঠে, স্পন্দন, নিরুদ্দেশ, নিঃস্ব, সেনানায়ক, সন্তরে, অগ্রদূত।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ ঃ

অগ্রদূত, গ্রন্থমালা, সোনার আলো, নিরুদ্দেশ, সৈন্যদল, অন্নজল, জ্ঞান গরিমা।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ

পিতা, অন্তর, স্পন্দন, নিরুদ্দেশ, পূজা।

৫। গদ্যরূপ লিখ ঃ

ক'রে, তুলে দে, পানে, হ'ব, সন্তরে, নাইক।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(খ) কবির নাম উল্লেখ কর।

২। (ক) 'কিশোর'-কথার অর্থ কি ?

(খ) কলম্বস কোন দেশের লোক ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত ?

(গ) 'টাটা' কে ? তাঁর সম্পূর্ণ নাম কি ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত ?

(ঘ) 'কার্ণানি' কে ? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(ঙ) 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'—কিভাবে তা সম্ভব আলোচনা কর।

(চ) 'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে'—অর্থ কি ?

(ছ) 'অগ্রদূত' কথার অর্থ কি ?

(জ) দেশের মাটি কিভাবে ধন্য হয় ?



বাংলা মা

কাজী নজরুল ইসলাম

[বিদ্রোহী কবি নজরুল এই কবিতায় বাংলা মায়ের রূপের মধুর বর্ণনা দিয়াছেন।]

আমার-শ্যামলা-বরণ বাংলা-মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলিরাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায় ॥

ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড়মাটি।
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণার সে বারি ছিটায় ॥

কাজলা দিঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক ;
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায় ॥

নদীর স্রোতে পাথর-নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজছে যে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টিপটি পরে সন্ধ্যা-তারার ;
ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায় ॥

হরিৎশস্যে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে ;
ভাটির স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়।

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। এই কবিতায় বাংলা মার কি কি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। কবিতাটির মর্মার্থ লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'আমার শ্যামলা-বরণ বাংলা মায়ের'—'শ্যাম্‌লা-বরণ' বলিবার কারণ কি ?

২। 'হরিৎশস্যে লুটায় আঁচল'—কথাটি বুঝাইয়া দাও।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লিখ ঃ শ্যামলা-বরণ, গিরি, দরী, বিজন, বেদে, অলিন্দ, ঝিল্লী, ভাটিয়াল।

২। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ
শ্যাম্‌লা-বরণ, ধূলিরাঙা, ভীরু মেয়ে, বিজন-মাঠ, হরিৎশস্য, গঙ্গাতীরে।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ
গঙ্গা-তীরে, শ্মশান ঘাটে, হরিৎশস্য, ডাকাত মেয়ে।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ
ভীরু, করুণা, শ্যামল।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবির নাম বল।

২। (ক) 'ভাটিয়াল' কি ? 'বাউল' কাহারা ? তাহাদের সম্বন্ধে কি জান ?
(খ) 'বৈরাগিনী' কে ? তিনি কি করেন ? কাহাকে বৈরাগিনী বলা হইয়াছে ? কেন বলা হইয়াছে ?
(গ) 'ডাকাত মেয়ে' কাহাকে বলা হইয়াছে ? বলার কারণ কি ?
(ঘ) কবিতায় যে মেয়েটির কথা বলা হইয়াছে তিনি কি ?
(ঙ) 'গিরি দরী'—কথার অর্থ কি ?
(চ) 'গঙ্গাতীরে শ্মশান ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়'—অন্তর্নিহিত অর্থ কি !



আহ্বান

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[কবি সকলকে আগাইয়া চলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলেই একদিন বিশ্বে ঠাঁই হইবে।]

আমাদের ডাক এসেছে
এবার পথে চলতে হবে,
ডাক দিয়েছে গগন-রবি
ঘরের কোণে কেইবা রবে।
ডাক এসেছে চলতে হবে আজ সকালে
বিশ্বপথে সবার সাথে সমান তালে
পথের সাথী আমরা রবির
সাঁজ-সকালে চলরে সবে ॥
ঘুম থেকে আজ সকালবেলা ওঠরে
ডাক দিল কে পথের পানে ছোটরে,
পিছন পানে তাকাস নি আজ চল সমুখে
জয়ের বাণী নূতন প্রাতে বল ও মুখে
তোদের চোখে সোনার আলো
সফল হয়ে ফুটবে কবে ॥

অনুশীলনী

[ক-বিভাগ]

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কবিতায় কবি কি আশা প্রকাশ করিয়াছেন ?

২। কবিতাটির মূল কথা সংক্ষেপে নিজ ভাষায় লিখ ?

৩। কবিতাটির বিষয়বস্তু লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'জয়ের বাণী নূতন প্রাতে বল ও মুখে'—'নূতন-প্রাতে' বলা হইয়াছে কেন?

২। 'আমাদের ডাক এসেছে'—কিসের ডাক ? আমরা কারা ? কিভাবে পথ চলিতে হইবে ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও ঃ

(ক) পিছন পানে তাকাস নি বল ও মুখে।

(খ) তোদের চোখে সোনার আলো
সফল হয়ে ফুটবে কবে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ ঃ

১। অর্থ লিখ ঃ বিশ্বপথে, সোনার আলো।

২। বাক্য রচনা কর ঃ বিশ্বপথে, সাঁজ-সকালে, বাণী, সমুখে, নূতন।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ ঃ
গগন-রবি, বিশ্বপথে, সাঁঝ-সকালে, সোনার আলো।

[খ-বিভাগ]

মৌখিক ঃ

১। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(খ) কবির নাম উল্লেখ কর।

২। (ক) আহ্বান কথার অর্থ কি ?
(খ) 'পথের সাথী আমরা রবির'—অর্থ কি ?
(গ) 'বিশ্বপথে' ও 'জয়ের বাণী' কথা দুইটির অর্থ কি ?
(ঘ) 'পেছন পানে' তাকাইতে বারণ করিবার কারণ কি ?